কমরেড লেনিন

শ্রীসনৎ মিত্র

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

ঃ পরিবেষক ঃ

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
শ্রীকণো মিত্র
[illegible] জেমস লঙ্‌ সরণি
[পূর্বতন, সত্যেন রায় রোড]
কলিকাতা ৩৪

সাহিত্য প্রকাশ

দ্বিতীয় প্রকাশ :
২১শে মার্চ ১৯৫৯

মুদ্রাকর :
শ্রীশক্তিপদ আঢ্য
নিউ মা-কালী প্রিণ্টার্স
১২/১ রামচাঁদ ঘোষ লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

বাল্যবন্ধু

ডাঃ শ্রীবিমলকুমার ঘোষাল

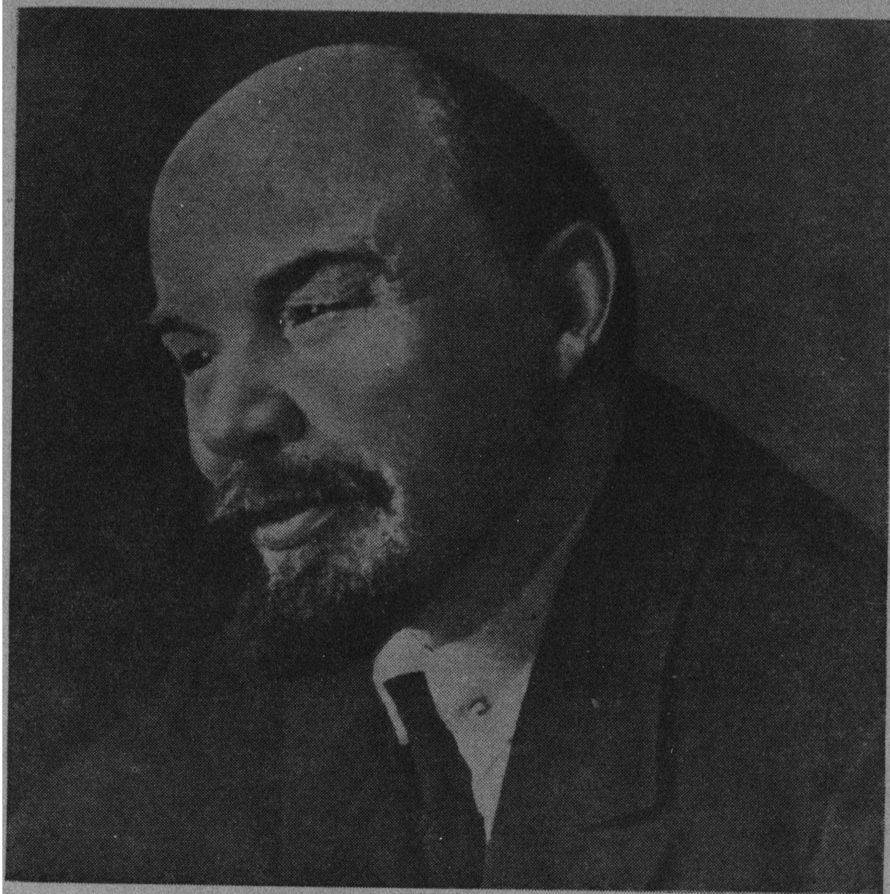
বি. এস. সি., এম. ডি. [ক্যাল],

এফ. আর. এম. এস. [লণ্ডন]

প্রীতিনিলয়েষু

'অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
........শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।

সুকান্ত ভট্টাচার্য



মহামতি লেনিন [১৯২১]



য়ুলিয়ানভ পরিবার [১৮৭৯]



লেনিন-জায়া ক্রুপস্কায়া
[১৮৯৫]



ঘেসুড়ের ছদ্মবেশে লেনিন [১৯১৭]



РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ (большевиков)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ №114482

Фамилия Ульянов (Ленин)
Имя и отчество Владим. Ильич
Год рождения 1870
Время вступления в партию 1893
Выдан Замоскворец-
(точное наименование организации,
кой
выдавшей билет)
Москва

Личная подпись В. Ульянов (Ленин)

Место фотографическ. карточки.

М. П.

Секретарь Укома Райкома

1922 г.

লেনিনের পার্টি-সদস্যের কার্ড

লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি [ছোট করে দেখানো হয়েছে]

১.

দেহ আর প্রাণ যেমন মিলে মিশে এক
পার্টি আর লেনিন তেমন-ই ॥
দেহ থেকে প্রাণ কে করে পৃথক ?
যখন দলের কথা বলা-কওয়া হয়—
সে কথার মানে যেন লেনিন,
আবার যখন বলি লেনিনের কথা
সে কথাই যেন হয় মোদের পার্টির।

মায়াকোভস্‌কি

লেনিন ! লেনিন !! লেনিন !!! বিশ্বের কানে কানে ডাকা একটি প্রিয় নাম—একটি ভয়ের নাম-সংকেত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে উচ্চারিত হয়ে এসেছে—আজও আসছে—এবং বোধ হয় আরও অনেক, অ-নে-ক দিন উচ্চারিত হতে থাকবে।

যারা সব হারিয়ে বসে ছিল, যারা অত্যাচারে, ক্ষুধায় আর পীড়নে নুয়ে পড়েছে, তাদের কাছে এই নাম অত্যন্ত প্রিয়—একান্ত আপনার। মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত। আর যারা শোষণের এবং অত্যাচারের রথ চালিয়ে মরা মানুষের হাড়ের ওপর তাদের সুখ-নিদ্রার গজদন্ত মিনার তৈরী করেছে—তাদের কাছে এই নাম বড় বিষাদের, বড় আতঙ্কের—চীৎকারের সঙ্গে উচ্চারিত ভয়ের মত।

এই অভিনব নামের অধিকারী মানুষটি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন আজ থেকে একশ বার বছর আগে—আমাদের দেশের অনেক উত্তরে—উত্তরের হিমালয় পাহাড় ডিঙ্গিয়েও রাশিয়ার মহান নদী ভল্‌গার ধারের ছোট্ট একটি শহর—সিমবিস্ক-এ।

আজকের রুশ দেশের অনেক কিছুর মতই এই শহরের রূপ-রঙ-আকৃতির সঙ্গে এর নামটাও পালটিয়ে গেছে। লেনিন-এর পরিবারের নামানুসারে সে-দিনের সেই সিমবিস্ক আজ পরিচিত হচ্ছে 'য়ুলিয়ানভস্ক' নামে।

এই ছোট্ট শহরের বাসিন্দা, য়ুলিয়ানভ দম্পতির তৃতীয় সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলো একটি শিশু। সময়টা হচ্ছে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল [রুশ দেশের পুরাণো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১০ই এপ্রিল]। মা মারিয়া আর বাবা ইলিয়া নিকোলায়াভিচ য়ুলিয়ানভ তাঁদের এই তৃতীয় সন্তানটির নাম রাখলেন ভ্লাদিমির ইলিচ য়ুলিয়ানভ। এই শিশুই বড় হয়ে দেশের প্রয়োজনে—জারের পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে, ছদ্মনাম নেন—লেনিন। এই লেনিন নামেই আজ তিনি পৃথিবী বিখ্যাত।

কথায় আছে 'বাপ কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া'। এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। লেনিন যে মহান হতে পেরেছিলেন —সমস্ত পৃথিবীর সামনে এক অভিনব উদাহরণ রচনা করেছিলেন, তার পেছনে তাঁর বাবার জীবন-বৈশিষ্ট্য যে, ভিত্তির কাজ করেছে তাও বলার প্রয়োজন আছে।

লেনিনের বাবা ইলিয়া অস্ত্রাকানের এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ছোট বেলাতেই বুঝেছিলেন যে কি কঠিন এই জীবন-সংগ্রাম—কি ভয়ঙ্কর শক্ত, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো।

কিন্তু তিনি হার মানেন নি সেই জীবন-যুদ্ধে। তাঁকে তো পরাজয় স্বীকার করলে চলবে না। কেন না কংসের কারাগারে কৃষ্ণের পিতার মত তাঁকে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে যে এক দেব-পুত্রের জন্ম দিতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি কঠিন পরিশ্রমের ফল হিসেবে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি পেয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। তিনি বৃত্তি হিসেবে বেছে নিলেন স্কুলের শিক্ষকতার কার্য।

তিনি হলেন, এক আদর্শ শিক্ষক। পেন্‌জা, নিজনি ইত্যাদি জায়গার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষকতা করে তিনি সমাজে সম্মানিতদের আসনে স্থান পেলেন।

এক রকম স্বয়ং নির্মিত মানুষ হিসেবেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন বলেই—তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে লেনিনের নিজেকে গড়ে নিতে কোন অসুবিধেই হয় নি।

গোড়া থেকেই ইলিয়ার একটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—যার জন্যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশে যে সমস্ত উচ্চ-শিক্ষিত, বিজ্ঞ মানুষ-জনেরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। এবং সেই থেকেই তিনি স্কুলের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে [১৮৬৯] সিমবির্স্ক-এর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শকের কাজ নেন। পরে তিনি এর ডিরেক্টরও হয়েছিলেন।

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। যার মানে সব সময় ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এখানেও সেই রকম এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে—অথবা, ছেলে লেনিনের কাজ সহজ হবে বলে বোধহয় কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে ইলিয়া স্কুল ইন্সপেক্টর ও ডিরেক্টরের কাজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় তৈরীর জন্যে এত উদ্যম দেখিয়েছিলেন। দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে সবার আগে দরকার শিক্ষা বিস্তারের। তাই শিক্ষা বিস্তারের কাজ করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় সরকারী বড় কর্তা, জমিদার, কুলাক প্রভৃতির অসন্তোষ ও বাধার মুখোমুখিও হয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাজের পথের কোন বাধাকেই মানেন নি। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে—প্রকৃত শিক্ষানুরাগীর মত, নিষ্ঠা নিয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে শীত-গ্রীষ্ম-শরৎ কিছুরই বিচার না করে, গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়েগেছেন।

ঃ 'প্রদীপ হাতে একটি ব্যক্তিত্ব'—শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে তিনি দরিদ্র-মুমূর্ষু-নুয়ে পড়া মানুষগুলোর অন্ধকার ঘরের দুয়ারে দুয়ারে গেছেন—ডেকে ডেকে বলেছেনঃ 'ওগো তোমরা এই চির জ্যোতির্ময় আলোর শিখায় তোমাদের জীবন আলোকিত করে তোলো,—ওঠো, জাগো, তোমাদের প্রাপ্য তোমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করো।'

এর ফলও ফলেছিল ভালো। ইলিয়ার কডি বছরের চাকরী জীবনে

সিমবির্স্কের মত জায়গাতেও স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ইলিয়ার এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যারা নিজেদের একমত ভাবতো এবং ইলিয়ার কাজে সাহায্য করতো—লোকে তাদের নাম দিয়েছিলো 'য়ুলিয়ানভিট্স্,' [য়ুলিয়ানভপন্থী]।

মা। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন—তাকে পৃথিবীর আলো দেখান—তারপর অনেক দুঃখের রাত পার করে তাকে জীবনের বিরাট-বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মানুষ মা-র কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন—মায়ের দেহের সঙ্গে মিশে থেকে যেমন প্রাণ বাঁচিয়েছেন, তেমনি সেইখান থেকেই জীবনকে গড়ে তোলবার প্রাণশক্তিও লাভ করেছেন। লেনিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কারণ, য়ুলিয়ানভ পরিবারের ছয়টি সন্তানের জননী হিসেবে—এক আদর্শনিষ্ঠ, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী পুরুষের স্ত্রী হিসেবে—বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মা হিসেবে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রোভ্না নিজেকে শিশুকাল থেকেই তৈরী করে নিয়েছিলেন।

এক দরিদ্র চিকিৎসকের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। বিরাট এক সংসারের মধ্যে অভাব-অনটনের ভেতর দিয়ে তাঁকে মানুষ হতে হয়েছিল; তাই তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পান নি। এই দুঃখ মারিয়া—লেনিনের মা, কোন দিন ভুলতে পারেন নি। তবুও শুধু নিজের চেষ্টাতেই তিনি কয়েকটি বিদেশী ভাষা শিখেছিলেন —এবং পরে ছেলেমেয়েদের এই সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ভাল পিয়ানো বাজাতে জানতেন। তাঁর আরও ইচ্ছে ছিলো যে স্বামীর পাশে পাশে থেকে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে স্বামীকে কিছু সাহায্য করেন। কিন্তু অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে, সংসারের কাজ-কর্ম করে, তিনি বিশেষ কিছুই করতে পারতেন না। তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলাত না। তবুও এর-ই মধ্যে থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষা পাশ করে নিতে ভোলেন নি। তাঁর এই বিদ্যানুরাগ, এই নিষ্ঠা, সুকুমার কলার প্রতি এই মমতা

—সর্বোপরি সহ্যশক্তি, প্রভৃতি চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর সন্তানদের মধ্যে খুব সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলো।

পরিচ্ছন্ন—সহৃদয়তায় পরিপূর্ণ—ভালোবাসা ও প্রীতি আচ্ছাদিত এবং আনন্দাঙ্গন স্বরূপ এই য়ুলিয়ানভ পরিবারই তো যথার্থ ক্ষেত্র, যেখানে কুড়ি কোটি মানুষের মুক্তি-দূত আবির্ভূত হতে পারবেন। আমি এখানে সমগ্র পরিবারের, পারিপার্শ্বিক জীবন-মণ্ডলের পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে দেখাবো যে কি কারণে ভ্লাদিমির ইলিচ য়ুলিয়ানভ-এর পক্ষে লেনিন হওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রথমেই লেনিনের বাবার কথা বলবো।

যতক্ষণ আর যতদিন, তিনি বাড়ীতে থাকতেন—গল্পে, আনন্দে আর প্রচণ্ড প্রাণময়তায় সারা বাড়ীটা ভরিয়ে রাখতেন। ছেলে-মেয়েদের সামনে তাঁর ব্যক্তি-জীবন, ত্যাগ-সেবা-আদর্শ ও পৌরুষ-দৃঢ়তার উদাহরণ হিসেবে সবসময়েই প্রোজ্জ্বল ছিলো। অপরপক্ষে, তিনিও ছেলেমেয়েদের সমাজ-কর্মে ও মানব-সেবায় উদ্বুদ্ধ হতে সবসময়েই অনুপ্রাণিত করতেন—উৎসাহ দিতেন। তাদের জানার আকাঙ্ক্ষাকে কোন সময়েই এড়িয়ে যেতেন না। ফলে, তাঁর অফিস থেকে পাওয়া সব ছুটিটা, সমস্ত পরিবারের সঙ্গেই কাটাতেন। আমরা চোখ বুজলে যেন দেখতে পাচ্ছি : একশ বছরেরও কিছু আগেকার রুশ দেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বসার ঘরের মধ্যিখানে এক প্রৌঢ় জমিয়ে গল্প করছেন। পাঁচটা ছেলেমেয়ে তাঁর চারদিকে ঘিরে বসে আছে—তাদের চোখে-মুখে, ভাবে-ভঙ্গিতে যেন সমস্ত জগতের বিস্ময় জমাট বেঁধে আছে—বর্ষার মেঘের মত। একটু দূরে গৃহিণী আগুনের কুণ্ডের কাছে বসে কি যেন বুনছেন—চোখ সেলায়ের দিকে—কিন্তু কান রয়েছে তাঁর, সেই গল্পের দিকে। একটা শিশু তাঁব কোলের কাছেই ঘুমিয়ে আছে। কাঁচের শার্সির ওপারে দেখা যাচ্ছে যে বাইরে পেঁজা তুলো ক্রমাগত আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে। বরফ পড়েছে।

এ ছাড়াও ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাব যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যে প্রত্যেকের মধ্যে নানারকম কাজের

ভার ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা ছিল। যেমন মেয়েরা দেখতো যে ভাইদের জামা-কাপড় সব পরিষ্কার আছে কিনা। মাঝে মাঝে বাড়ির লাগোয়া বাগানে যখন খাবার ব্যবস্থা করা হতো তখন ছেলেরা চেয়ার-টেবিল বয়ে নিয়ে যেতো—আর মেয়েরা খাবার গোছানো, সাজানো, প্লেট-চামচে ধোয়া ইত্যাদি কাজে মায়ের সহযোগিতা করতো। চরিত্র গঠনের পক্ষে এই টিমওয়ার্ক পরবর্তী জীবনে, অন্ততঃ লেনিনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই কাজে লেগেছিলো।

অবার কখনও কখনও প্রদীপ্ত উৎসাহের ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তিই সব ছেলেমেয়েদের বোঝাতেন যে—সত্যবাদিতা এবং সত্যদর্শিতাই হচ্ছে জীবন-পথের আলো। চারিত্র্য-গৌরব, সাহস এবং আত্মবিশ্বাস হচ্ছে সমস্ত বাধাকে ভেঙ্গে ফেলার একমাত্র পাশুপাত। বলতেন আর বোঝাতেন ; এবং প্রায়ই তাঁর প্রিয় কবি নেকরাসভের কবিতা উচ্চ আবেগে পাঠ করতেন। প্রচণ্ড পৌরুষ কণ্ঠে গান ধরতেন ঃ

'ঝড়ে এবং যুদ্ধে সতেজ সৌভ্রাত্র
নিয়ে, পাশাপাশি আমবা দাঁড়াবো—
উভয়ে আমবা মরণ না আসা পর্যন্ত,
হে আমার জন্মভূমির বঞ্চিত মানুষেরা।'

তাই এই বঞ্চিত মানুষের স্বপক্ষে প্রায় সমস্ত পরিবারই আত্মোৎসর্গ করলো। বড়ভাই আলেকজান্দার সেই কবে—ভ্লাদিমিরের যখন মাত্র সতের বছর বয়েস, তখনই—রুশ সম্রাট জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

অত্যাচারী—অত্যাচার এবং আরও বেশী পীড়নের মধ্যে দিয়ে নিজের মৃত্যু-কবর নিজেই খোঁড়ে। এই হচ্ছে ইতিহাসের নিয়ম —প্রকৃতির নির্দেশ। এ ক্ষেত্রেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। কেন না দেখা যাচ্ছে লেনিনের জন্মাবার আগে থেকেই—এবং তাঁর শৈশব কালেও রুশ দেশের জারের শাসন-ব্যবস্থা বেশ টলমলে—ঢিলেঢালা ছিল। কিন্তু এমন ভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না। —তাই জার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার অত্যাচার

এবং পীড়নের মধ্যে দিয়ে রুশ দেশে বেশ খানিকটা শৃঙ্খলা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। তিনি দেশের প্রতিটি স্বাধীন চিন্তা—প্রত্যেকটি নিজস্ব মতামতকে পিষে দলে দিতে লাগলেন—সারা দেশে নেমে এলো শ্মশানের শান্তি। ফাঁসি ও মৃত্যুদণ্ডের নৈঃশব্দ। সমস্ত রাশিয়ায় দ্বিতীয় আলেকজান্দারের জয় জয়কার—ভয়ে ভক্তি আর কি!

কিন্তু যাঁরা জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করেছেন—যাঁদের কাছে ফাঁসির দড়ি বরমাল্যের মত—বুলেটের গুলি মায়ের আদরের মত, তাঁরা তো এই ভয়ঙ্কর শান্তি মেনে নিতে পারেন না। তৈরি হলো 'নারোদনায়া ভোলিয়া' [জনগণের ইচ্ছা] নামে এক গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠন। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে,—অনেক—অনেক রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে যেমন নবজাতক পৃথিবীর আলো দেখে—দেবদূতের মত ধুলার ধরণীতে হাসে-খেলে, ঠিক তেমনি এই বিপ্লবী পার্টি জনগণের ইচ্ছায়, জনগণের জন্যেই, জনগণের মধ্যেই কাজ করতে আরম্ভ করলো। এবং জনগণের কণ্ঠরোধকারী মৃত্যু-অনুচরকে, দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে, 'নারোদনায়া-ভোলিয়ার' বিপ্লবী সংগঠনের লোকেরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেন—পৃথিবীর ভার বুঝি অনেকটা হালকা হলো। সেটা হচ্ছে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ।

এই সংগঠনটি ছিল একটা সন্ত্রাসবাদী দল। এঁরা মনে করতেন যে বোমা মেরে—পিস্তল দিয়ে জার আর তাদের অনুগতদের গুপ্তহত্যা করতে পারলেই জারের শাসন-পীড়নের অবসান ঘটবে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্দারও একমত হলেন। তিনি তখন থাকতেন রুশদেশের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে [বর্তমান লেনিনগ্রাদ] শহরে।

রাজধানীতে 'নারোদনায়া ভোলিয়া' বিপ্লবী দল বেশ শক্তিশালী ছিল। তাঁরা দলে আলেকজান্দারের মত সাহসী, শিক্ষিত এবং দৃঢ়সংকল্প যুবককে পেয়ে বেশ খুশিই হলো। এবং রুশ দেশের নতুন সম্রাট [জার] তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার ষড়যন্ত্রটা আরও

পাকা করে ফেলতে পারলো। ষড়যন্ত্র যখন পাকা। আর কিছুদিনের মধ্যেই জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে পৃথিবীর আলো থেকে চিরবিদায় নিতে হবে, এমন সময় সব ধরা পড়ে গেল। সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় আলেকজান্দারের হত্যার পর থেকেই রুশ পুলিশ রীতিমত সজাগ ও সক্রিয় হয়েছিল। তাই ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ লেনিনের বড় ভাই এবং তাঁর আর সহকর্মীরা রুশ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। জারের অত্যাচারের অবসান করার আশা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। তাই-ই হয়। এই সন্ত্রাসবাদের গুপ্তহত্যামূলক রাজনীতির এ রকম পরিণতিই ঘটে থাকে। কারণ দেশের সমস্ত জনসাধারণকে সচেতন করে—তাদের সঙ্গে নিয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সশস্ত্র ভাবে লড়াই করে দেশের সামাজিক পদ্ধতিকে আমূল পাল্টে না দিলে, কখনও অত্যাচার-শাসন শেষ হয় না।

আমাদের দেশেও এমনটিই দেখা গেছে—সন্ত্রাসবাদের পথ ভ্রান্ত পথ—ইতিহাসে তা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য তাই বলে তাঁদের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা পোষণ করা যায় না—তাঁদের পথ ভুল হতে পারে—কিন্তু তাঁদের সাহস, তাঁদের প্রবল ও একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেম, তাঁদের নিষ্ঠা আর সততাকে তো অসম্মান করা যায় না। তা-ছাড়া 'ধরণীর ধন কিছুই যাবে না ফেলা'—তাঁদের ভুলের ওপরেই তো গড়ে উঠবে শৃঙ্খল মুক্তির, স্বাধীনতার সার্থক অট্টালিকা। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

যাক্, যে কথা বলছিলাম। আলেকজান্দার এবং তাঁর সঙ্গীরা রাজ-হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়ার পর তাদের বিচার হলো—বিচার না বলে বিচারের প্রহসন বলতে পারি তাকে। সেই বিচারে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আলেকজান্দার এবং তার চারজন সঙ্গীর প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। য়ুলিয়ানভ পরিবারে প্রথম শহীদ হলো। আর, এই ঘটনা প্রচণ্ড আঘাত হানলো—ছোট ভাই ভ্লাদিমিরের সতের বছরের কিশোর-কোমল মনে। কিন্তু তিনি

এতে ভেঙ্গে পড়লেন না—এই আঘাতকে আরও জোরের সঙ্গে ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে থাকলেন।

সে এক বিরাট—এক অবাক করা ইতিহাস। আমরা পরে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

এই ভাই-এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিনের সবচেয়ে বড় বোন আন্না বলেছেন: 'আলেকজান্দারের যেমন কঠিন কর্তব্যজ্ঞান, তেমনিই অতুলনীয় তাঁর গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাশীলতা। স্পর্শকাতর সহৃদয়তাই তাঁকে স্বদেশ-জননীর দুঃখ মোচনে জীবন বাজী রাখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছোটদের কাছে আমার এই ভাইটি ছিল ভারি প্রিয়। ভ্লাদিমির একেই অনুকরণ করতে সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছিল।'

আন্নার এই স্মৃতির কথাই সত্যি। কেন না, ভ্লাদিমির প্রায়ই একটা কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতেন: 'এবিষয়ে আলেকজান্দার যা করতো আমি তা-ই করবো।' এই বড়দার জীবন-সংগ্রাম লেনিনের কাছে ছিল উত্তর আকাশের তারা—পথ দেখাতো, সামনে চলতে সাহস যোগাতো। এই ভায়ের কাছেই তিনি প্রথম সাম্যবাদী সাহিত্যের সন্ধান পান, এবং এঁর হাতেই তিনি এযুগের সর্বহারাদের বেদ, কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটল' বইটি দেখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভ্লাদিমিরের জীবনের আরও একটি ঘটনার উল্লেখ একান্তভাবেই করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে যে, তাঁর যখন ষোল বছর বয়েস তখন থেকেই ধর্মচর্চা, চার্চে যাওয়া ইত্যাদিকে অপছন্দ করা। কেন না, দেখা যাচ্ছে, যে ঐ সময়ে ভ্লাদিমিরদের বাড়িতে তাঁর বাবার এক বন্ধু বেড়াতে আসেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে ভ্লাদিমিরের বাবা ইলিয়া জানান যে তাঁর ছেলেমেয়েরা বড় একটা গির্জায় যেতে চায় না। এ কথা শুনে ঐ ভদ্রলোক কিছুটা রেগে গিয়েই বললেন যে এই সমস্ত গর্হিত কাজের জন্যে ওদের বেত মারা উচিত। এতে ভ্লাদিমিরের কিশোর মনে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগে—এবং ঠিক করেন যে সে আর কিছুতেই চার্চে যাবে না। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে

বাড়ির উঠানে গিয়ে গলার ক্রুশকাঠিটা ছিঁড়ে ফেলেন।

তাই বলছিলাম 'ধরণীর ধন কিছুই যাবে না ফেলা'—আলেকজান্দারের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ভ্রান্ত পথের নির্দেশ দিলেও, তাঁর জীবন-প্রেরণা থেকে ছোট ভাই লেনিন যে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দীপ জ্বালিয়ে নিলেন তাই-ই আজ মশাল হয়ে—সূর্য হয়ে—অসংখ্য স্তালিন—হো চি মিন—কস্ত্রো—মাও সে তুং—আরো, আরো জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র হয়ে, সারা পৃথিবীতে শত সূর্যের দীপ্তি বিকিরণ করছে।

কথায় আছে, সকাল দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে—শৈশবেই আগামী মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিনের দাদা আলেকজান্দারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই বিদ্যালয়ে একটা রচনা লিখেছিলেন। রচনাটার নাম হচ্ছে: 'রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে একজন কি ভাবে নিজেকে ব্যবহার করবে।' এই রচনা লেখার মধ্যে দিয়েই আলেকজান্দার যেন তাঁর উত্তর জীবনের কর্মধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন: 'নিজেকে সমাজের প্রয়োজনে লাগাতে হলে সৎ এবং কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, এবং সে এমন কাজ করবে যাতে সেই কাজ বৃহত্তম সাফল্য নিয়ে আসে। তাকে বুদ্ধিমান এবং ইতিকর্তব্য নির্ধারণে তৎপর হতে হবে। জীবনের সূচনার প্রথম সময় থেকেই তাকে—যাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, তাদের প্রতি মমতা এবং নির্ভুল কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে হবে। কারণ, এইগুলিই তাকে পথ দেখাবে, তাকে সমস্ত কর্তব্য নির্ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। যার দ্বারা, হয় সে সমাজের সকলের মঙ্গল-কর্ম করবে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথে ঘুরে মরবে:....কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যা ভয়ঙ্কর তাও করতে হবে। সমাজের একজন প্রকৃত সদস্য হতে হলে বাইরের ঘটনাচক্রে উপস্থিত, অথবা, নিজের দোষ-ত্রুটির ফলে উদ্ভূত যে কোন কঠিন ও বাধা-প্রাপ্ত কাজকে—ভীত না হয়েই, সমাধা করতে হবে।'

আলেকজান্দারের যখন বিচার হয়—জারকে হত্যার চেষ্টা করার

অপরাধে যখন সমস্ত য়ুলিয়ানভ পরিবারের ওপরই রাজরোষ নেমে এসেছে, সেই বিপদের দিনে, কয়েকটি ছোট বড় ছেলেমেয়ে নিয়ে, মারিয়া সমস্ত সংসারের হাল ধরেছেন। তাই-ই হয়। হাঁসকে সাঁতার কাটা শেখাতে হয় না। সংসারের গিন্নী মারিয়াকে উপস্থিত বুদ্ধি-সাহস এবং ধৈর্য ধরা শিখতে হলো না। গরীব ডাক্তার বাপের বাড়ীতে—দৃঢ়চেতা শিক্ষাবিদ্ স্বামীর ঘরে এসে, তিনি ভেতরে ভেতরে সমস্ত পাঠ শেষ করে রেখেছিলেন। তাই বিপদের মুখে পড়েই দুঃখ-তুফানের প্রথম ঝাপটা লাগতেই তিনি পাকা নাবিকের মত চক্কর খাওয়া সংসার-নৌকাটাকে সামলে নিলেন। ধাক্কা লেগে একটু একটু দুলে উঠলো বটে, কিন্তু ডুবলো না। স্মিত হাসিতে, প্রেম-প্রীতিতে, শান্ত অথচ দৃঢ় শাসনে মারিয়া যে সংসার-পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তারই প্রসন্ন ছায়ায় তাঁর সন্তানদের জীবন-প্রদীপগুলি একের পর এক জ্বলে উঠেছিলো। এদের জীবনে, তিনি আপন শক্তিতে বেগ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন বলেই, নিজেও কোন কিছুতে ভয় পাননি।

তাই দেখি যে, আলেকজান্দার ধরা পড়লে তিনি সেণ্ট পিটার্স-বুর্গে চলে আসেন। দিনের পর দিন পুত্রের বিচারের নামে প্রহসনাভিনয় লক্ষ্য করেন। পুত্র আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কোন উকিল নেয় নি—তিনিও কিছু বলেননি। [জানতেন বোধ হয় বলেও কোন ফল হবে না]। তারপর....। তারপর যখন সেই চরম দিন আসে—বিচারকের রায় দেবার দিন—সেদিন [তিনি কি কেঁদে ছিলেন ? না বোধহয়। কারণ তিনি যে লেনিনের মা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতার মা। তাঁকে কি কাঁদলে চলে]। —তাঁর চোখ দিয়ে বোধহয় আগুন ঠিক্‌রে বেরিয়েছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে শত মরুভূমির উত্তাপ ঝরে পড়েছিল।

সকলেই জানেন যে প্রতিমা গড়লে তার চালচিত্র দিতে হয়। ঘর গড়লে তার ভিত। আমরা এখানে লেনিনের বাবা-মা-বড়দা এঁদের বিষয়ে বেশ বিস্তারিত ভাবেই অনেক কথা বললাম। কেন ?

কারণ ভ্লাদিমির যে লেনিন হলেন—রুশ দেশ যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হলো—অত্যাচারী নয় অত্যাচারিতই যে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রভু হলো—তার চালচিত্র কি ?—তার ভিত কোন গভীরে পোঁতা ছিল তা দেখাবার জন্যেই ওঁদের সম্পর্কে এত কথা বললাম।

তিল তিল করে তিলোত্তমা। বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে মহাসমুদ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণায় মহাদেশ। আর বাবা-মা-বড়দা এবং আরও অনেকের অনেক কিছু নিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

আগেই জেনেছি যে রাজার আদেশে ভ্লাদিমিরের বড়দার মৃত্যুদণ্ড যখন কার্যকরী হয় তখন তাঁর [ভ্লাদিমিরের] বয়েস হয়েছিল সতের বছর একমাস। সেই বছরেই তাঁর স্কুলের পাঠও শেষ হয়।

ভ্লাদিমিরের বয়েস যখন ন-বছর তখন তিনি সিমবির্স্ক-এর জিমনাসিয়ম [গ্রামার স্কুল] উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি মোট আট বছর পড়াশুনা করেছিলেন। এবং দাদার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে, তারই ফলে তাঁর পাঠে একাগ্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি ঐ স্কুল থেকে পাশ করা সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র—যিনি সোনার মেডেল পেয়েছিলেন।

তাঁর এই স্কুল-জীবনে, তিনি যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, পাঠে মনোযোগ, সময়ানুবর্তিতা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা বিরল। ঐ অল্প বয়সেই তিনি রোজ নিয়মিত সময়ে ঘুম থেকে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে, তৈরী হয়ে নিতেন। পরে সকালের জলখাবারের সময় থেকে স্কুলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পুরাণো পড়াগুলোকে আর একবার ঝালিয়ে নিতেন। এবং সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর স্কুলে পৌঁছাতে কোনদিন একটুও বিলম্ব হতো না। স্কুলের দীর্ঘ আট বছরের ছাত্রজীবনের এই ঘটনার খুব একটা ব্যতিক্রম কেউ কখনো লক্ষ্য করে নি। আমাদের দেশের ছাত্রদের কি এর থেকে কিছু শেখার আছে ?

যাক, যা অনিবার্য তা ঘটবেই। ইতিহাস নিজের পথ নিজেই

করে নেবে। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্দারের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। ভ্লাদিমির উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এলেন। আর য়ুলিয়ানভ পরিবারও সিমবির্স্ক-এর বাস তুলে দিলেন। সময়টা ছিল ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস। অনেক স্মৃতিবিজড়িত, অনেক হাসিকান্নার মায়া-ঘেরা সিমবির্স্ক-এ থেকে কি আর হবে ?

পরিবারের কর্তা কিছুদিন আগেই চোখ বুজেছেন [১৮৮৬ খ্রীঃ]। বড় ছেলে এক প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে শেষ হয়েছেন। তবে আর কি, চলো। এখানকার পাততাড়ি গোটাও....

চলো। চলাটাই জীবন। থামলেই মৃত্যু। য়ুলিয়ানভ পরিবারও তাই থামলো না। সিমবির্স্ক থেকে উঠে এসে তাঁরা ডেরা বাঁধলেন রুশ দেশের অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র কাজানে। মহান ভল্‌গা নদীর ধারে এই বিরাট আর জাঁকজমকপূর্ণ শহরটায় তাঁরা এলেন। অবশ্য জুন মাসে সিমবির্স্ক থেকে কাজানে চলে আসার আগে, তাঁরা কোকুস্‌কিনো [বর্তমান নাম লেনিনো]-য় লেনিনের দাদামশায়ের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। লেনিনের বাবা যখন বেঁচেছিলেন তখন গরমকালে তাঁরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন।

কোকুস্‌কিনো [Kokushkino]-তে যখন ছোটবেলায় গরমের দিনে তাঁরা মাঝে মাঝে এসে থাকতেন, তখন ভ্লাদিমির বা তাঁর ভাই-বোনেরা এখানকার একটা মজার অভ্যেস রপ্ত করেছিলেন। সেই অভ্যেসটা তাঁরা গরমের শেষে সিমবির্স্ক-এ ফিরে গিয়েও সহজে ছাড়তেন না। অভ্যেসটা হলো ঘর থেকে বাইরে যাবার সর্ট-কার্ট রাস্তা হিসেবে দরজার বদলে জানলার ব্যবহার। ভ্লাদিমিরের বাবা-মা প্রথম প্রথম এই মজার ঘটনা নিয়ে খুবই আমোদ করতেন —শেষে ইলিয়া ছেলেমেয়েদের বকা-ঝকা না করে, ছোট ছোট তক্তা দিয়ে জানলার দু-দিকে সিঁড়ি করে দিলেন। যাতে এই সব খুদে এ্যাডভেঞ্চারিস্টদের যাতায়াতের কোন অসুবিধে না হয়।

কাজানে এসে ভ্লাদিমির কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে [Faculty of law] ভর্তি হলেন। এখানে এসেই—অথবা বলতে পারি—এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তিনি মন স্থির করে ফেলেন যে, তিনি তাঁর জীবনকে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যে উৎসর্গ করবেন। এই উদ্দেশ্য এবং প্রতিজ্ঞা মনে মনে ছিল বলেই তিনি তাঁর পাঠ্য-বিষয় হিসেবে নির্বাচন করলেন সমাজ-বিজ্ঞান। এ বিষয়ে তিনি যে মন্তব্যটি করেছিলেন সেটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'এই তো সময় যখন একজনের অবশ্যই আইন এবং রাজনৈতিক-অর্থনীতি অধ্যায়ন করা উচিত'।

লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ভর্তি হলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অত সহজে তাঁর নাম ছাত্র-তালিকাভুক্ত করতে রাজী হলো না। কেননা —তিনি যে 'রাজ-অপরাধী' পরিবারের ছেলে। এই ছাত্রটির বড়ভাই-এর জারকে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়েছে—বড় বোন জেলে গিয়েছে। অতএব একে ভর্তি করার আগে অবশ্যই অনেক চিন্তা করতে হবে—অনেক খোঁজ-খবর নিতে হবে—তবে তো।

: তা দেখুন না যত খুশি। খোঁজ নিন না, যেখানে ইচ্ছা আপনাদের। জিজ্ঞাসা করুন, যাকে ইচ্ছা, তাকে।

খোঁজ নেওয়া হলো যে শহর থেকে তাঁরা এসেছেন সেই শহর, সিমবিস্ক-এ। জানতে চাওয়া হলো সিমবিস্ক জিমনাসিয়মে। সব জায়গা থেকেই ভালো খবর এলো: না! ভালো ছেলে। পড়াশুনায় তো তুলনা হয় না,—এবং আচার-ব্যবহারেও খুবই ভালো। এমন বড় একটা দেখা যায় না। তবে....

: তবে কি?

: তবে, পরিবারটা বড় গরম। বিপ্লবী প্রায় হাড়ে-মজ্জে।

: তা হোক, এ ছেলেটা তো ভালো। তা-হলেই হলো।

ভ্লাদিমির তো ভর্তি হয়ে গেলেন। যথারীতি ছাত্র-তালিকায় তাঁর নামও উঠে গেল। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়টার ধরণ-ধারণ মোটেই ভালো ছিল না। জারের নির্দেশে এখানে কোন রকম

সমিতির সভ্য হওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এক কথায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের নিয়ম অনুসারে কোন রকম গণতান্ত্রিক চেতনা বা আচরণই যে-কোন ছাত্রের পক্ষেই সম্পূর্ণ বে-আইনী ছিল। এই নিয়ম ভঙ্গ করলেই কঠোরতম শাস্তি—অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁর রক্তে বিদ্রোহের লোহিত কণিকা বহমান—যাঁর চিন্তায় বিপ্লবের আগুন নিয়ত-প্রোজ্জ্বল তিনি যে অচিরেই বে-আইনী 'সামারা-সিমবিস্ক' ক্লাবে'র একজন সক্রিয় সভ্য হয়ে যাবেন এর আশ্চর্য কি? ঐ ক্লাবের বিপ্লবী ছাত্র-চক্রের সংসর্গে এসেই বিপ্লববাদের পাঠে তাঁর হাতে-খড়ি হয়।

এই সময়ের রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও একটা কুৎসিত বিষয়ের চল ছিলো, তা হলো—গুপ্তচর বৃত্তি। বাইরে থেকে লোক এসেও যেমন ছাত্রদের ভেতরের সমস্ত গোপন কার্যকলাপের খবরা-খবর নিতো এবং যথা সময়ে তা পুলিশের কাছে জানিয়ে দিতো, —ছাত্রদের মধ্যেও এই ধরণের টিকটিকি মার্কা ছেলে বেশ অনেক সংখ্যাতেই ছিলো।

ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাব—বিতাড়িত ছাত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পুলিশের অসঙ্গত-ভাবে ঘোরাফেরা ও খবরা-খবর সংগ্রহ বন্ধের দাবীতে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর কাজান শ্বিববিদ্যালয়ের এ্যাসেমব্লি হলে, মূলত প্রগতিশীল ছাত্রদের উদ্যোগে, এক বিরাট সভা ডাকা হয়। এই সভায় ছাত্রদের দাবীগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ভ্লাদিমির ছিলেন সভাকারীদের সঙ্গে প্রথম সারিতে। এই ঘটনায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্তরে উপস্থিত রাখেন। এই দিনের ঘটনাকে 'কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-চত্তরের আধিকারিক' একটা ভীষণ কাণ্ড বলে বর্ণনা করেন; এবং লেনিনকে সেই কাণ্ডের উগ্রতম নায়ক বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

এই সভা থেকে এসে লেনিন তাঁর ছাত্র-অভিজ্ঞান পত্র [Stu-

dent's Card] জমা দিয়ে দেন। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সৈন্য-সমাবেশ করার প্রতিবাদে তার পরের দিন অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের কাছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের ইচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি দেন। ঐ একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করেন। এবং দু-দিনের এই সমস্ত কাজের স্বাভাবিক যা ফল তা অচিরেই ফললো। কাজান শহরে তাঁর বাস নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। এবং ৭ই ডিসেম্বর তাঁকে কোকুশকিনো গ্রামে নির্বাসিত করা হলো। কাজানের গভর্ণরের নির্দেশে ভ্লাদিমির রুশ পুলিশের অতিথি হয়ে গেলেন।

ভ্লাদিমিরকে নির্বাসনে নিয়ে যাবার পথে সঙ্গের পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর এক মজার কথোপকথন হয়েছিলো। তাঁর জীবনী লেখকেরা অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে সেই কথাবার্তার বর্ণনা দিয়েছেন। যে পুলিশ কর্মচারিটি ভ্লাদিমিরকে জেলে নিয়ে যাচ্ছিল সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো: 'ওহে ছোকরা! বিদ্রোহ করে কি হবে? তুমি কি দেখছো না, তোমার সামনে দেওয়াল রয়েছে?'

তরুণটি সাহস-দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলো: 'কিন্তু দেওয়ালটা বড়ই পুরাতন আর জীর্ণ। একে সজোরে একটা ধাক্কা দেওয়ার অপেক্ষা। আর তা দিলেই এটা ভেঙ্গে পড়বে।'

এই ভাবে মাত্র সতের বছর আট মাস বয়েসে লেনিনের বিপ্লবী সংগ্রামের পথ ধরে ক্লান্তিহীন যাত্রা সুরু হলো। আর থেমে ছিলেন সেই সেদিন, যেদিন:

> 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
> অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।'

নির্বাসন। বাইরের কারুর সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে দেওয়া হবে না। ভালই হলো। শাপে বর হলো। যেমন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীরা বন্দী বা নির্বাসিত অবস্থাটা মোটেই নষ্ট করতেন না। লেনিনও করলেন না। নির্বাসনের দ্বারা বাইরের দুয়ারে কপাট লাগুক না কেন—পড়াশুনার মাধ্যমে

ভিতরের দরজাটা তো খুলে ফেলতে পারি। ভ্লাদিমিরও তাই করলেন। প্রথমবারের এই এক বছর রাজনৈতিক নির্বাসনে তিনি অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, সামাজিক-রাষ্ট্রনীতি, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক ধরণের বই পড়ে ফেললেন। অনেক দিনের না খেতে পাওয়া লোক যেমন খাবার পেলে গোগ্রাসে গিল্‌তে আরম্ভ করে, তিনিও অনেকটা সেই রকমভাবে কণ্ঠ ভরে, মনের আশা মিটিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, এমন প্রচুর পরিমাণে, আর গভীর ভাবে পড়া তিনি আগে কখনই করেন নি। এমনকি সেণ্ট পিটার্স বুর্গের জেলখানায় বসে বা সাইবেরিয়ার নির্জন নির্বাসনে থেকেও এতটা পড়াশুনা তিনি করেন নি। সেই সকাল থেকে একেবারে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করতেন। এ যেন নিজেকে আগামী নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া। জারের দেওয়া নির্বাসনে বসে আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের মত, যেন গভীর সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন।—এই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলেন বলেই রুশ দেশের কোটি কোটি নিরন্ন ছন্নছাড়া মানুষগুলোকে বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলতে পেরেছিলেন—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগো রে সকল দেশ।'

এবারের নির্বাসন হলো একবছরের জন্যে। মেয়াদ শেষ হলে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে তাঁকে কাজান শহরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হলো—কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে আর পড়তে দেওয়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা 'শিক্ষা আধিকারিক'কে লেনিনের শিক্ষাগত যোগ্যতা—ছাত্ররূপে কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর প্রশংসা সূচক মন্তব্য করলেও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেওয়ার রাজনৈতিক বিপদ সম্পর্কে বিপদজনক শব্দ ব্যবহার করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি না পেয়ে ভ্লাদিমির গভর্ণমেণ্টকে জানালেন যে, তাঁকে যদি দেশে থেকে পড়াশুনা করতে না-ই দেওয়া হয়; তবে অন্ততঃ বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করতে দেওয়া হোক। কিন্তু, দেশের পুলিশ বিভাগ কাজানের গভর্ণরের কাছে চিঠি পাঠিয়ে

জানান যে ঃ 'না! য়ুলিয়ানভ ভ্লাদিমিরকে বিদেশে যাওয়ার পাশপোর্ট দেওয়া যেতে পারে না'।

কিন্তু এভাবে কিছু না করে তো চিরদিন বসে থাকা যায় না ; লেনিনের ক্ষেত্রেও গেল না। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই নিকোলাই ফেদোসিয়েভ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে তৈরী একটা মার্কসবাদী পাঠচক্রে যোগ দিলেন। এই সময়ে কাজান এবং তার আশেপাশে গুপ্ত বিপ্লবীদের অনেকগুলি দল গড়ে উঠেছিল। তারা গোপনে গোপনে মার্কস-এঙ্গেল্‌সের লেখা পড়তো এবং তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হতো—আলোচনা চলতো। ভ্লাদিমির এদের সঙ্গে থেকে আলোচনা করতেন। এইসময়ে তাঁর গত একবছরের নির্বাসনে থেকে করা পড়াশুনাগুলি বেশ কাজে লাগলো।

আসলে মার্কসবাদে বিশ্বাসী লোক অপেক্ষা তখন নারোদনিকদের সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং কর্মীর সংখ্যাই রাশিয়াতে ছিল বেশী পরিমাণে। আর এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বাধিক ছিল দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকদের মধ্যেই। দেশে মার্কসবাদের অনুসরণে সর্বহারা শ্রেণীর কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কাজ সংগঠিত করতে গিয়ে অন্যান্যদের মত লেনিনকেও এই সন্ত্রাসবাদী নারোদনিকদের বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হলো।

যাই হোক, কাজানে বসে, মার্কসীয় পাঠচক্রের মধ্য থেকে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মার্কসীয় দর্শন-সক্রান্ত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ করে লেনিন অন্যতম প্রথম ও প্রধান রুশীয় সাম্যবাদীরূপে পরিচিত হলেন। এবং বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রচার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রটি রচনা করতে লাগলেন।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে য়ুলিয়ানভ পরিবার সামারা গুবেরনিয়ার কাছে আলাকায়েভকা নামে একটা গ্রামে উঠে আসেন। পরে, ঐ বছরেরই শরৎ কালে তাঁরা চলে আসেন সামারায় [বর্তমানে নাম হয়েছে কুইবিশেভ]। এই সময়ে যদি তাঁরা কাজান ছেড়ে চলে না আসতেন তবে ভ্লাদিমিরকে আরও একবার

সরকারী জেলখানার অতিথি হতে হতো। কারণ, তাঁদের চলে আসার দু-মাসের [জুলাই] মধ্যেই পুলিশ কাজানের গোপন পাঠচক্রের সংবাদ পেয়ে যায়—এবং নিকোলাই ফেদোসিয়েভসহ পাঠ-চক্রের আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

এখানে অর্থাৎ সামারায় এসে ভ্লাদিমির একদিকে যেমন কিছু কিছু রোজগারের ধান্দায় থাকলেন, তেমনিই প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘ চার বছরের আইনের কঠিন পাঠক্রম মাত্র আঠারো মাসের মধ্যে শেষ করে তিনি দুই কিস্তিতে পরীক্ষা দিয়ে দেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের বসন্ত এবং শরতে, আইনের এই পরীক্ষা দিতে আসার সূত্রে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদী ব্যক্তিদের যোগাযোগে এসে যান। কথায় আছে, যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। লেনিনের ক্ষেত্রেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ—মতবিনিময় ও বই-পত্তরের দেওয়া-নেওয়ার সংযোগ ঘটতে আদৌ দেরী হলো না।

পরীক্ষার ফল বেরুতে দেখা গেল যে, তিনি, সমস্ত পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছেন। এরপর ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীর শেষ দিকে তিনি সামারা সার্কিট কোর্টে আইন ব্যবসা সুরু করেন। এই কোর্টে তাকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আইনজীবী হিসেবে দেখা গেছে। এই ওকালতির সময়ে ভ্লাদিমিরের মক্কেলদের বেশীর ভাগই ছিল গ্রামের গরীব কৃষক ইত্যাদি। কিন্তু ওকালতিতে তাঁর বিশেষ মন ছিল না—আসল লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদকে বোঝা এবং বোঝানো—তার প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে বার করা। এই সময়েই, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে, তিনি সামারায় ছোট এক মার্কসবাদী পাঠচক্র স্থাপন করেন— যেখানে প্রধান কাজ ছিল, মার্কসবাদ পড়া-পড়ানো, আলোচনা করা এবং ধীরে ধীরে মার্কসবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীকে বড় করে তোলা।

কাজান এবং সামারায় লেনিনের কর্মধারাকে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্যোগপর্ব বা প্রস্তুতির সময় বলে মনে করা হয়। মাটির

তলায় ভিতটা লুকিয়ে থেকে যেমন, মস্ত বড় অট্টালিকাটাকে ধরে রাখে, তেমনি কাজান ও সামারার মত মফস্বল শহরে লেনিন যে জীবন অতিবাহিত করলেন, তা আগামী দিনে রুশ পলেতারীয় বিপ্লবকে সফল করতে, নেপথ্যে থেকে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু সূর্য কতক্ষণ পূব আকাশে থাকে। তাকে মাথার ওপর উঠে এসে প্রচণ্ড তেজ সৃষ্টি করতেই হয়। তাই ভ্লাদিমির ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে তখনকার রুশ দেশের রাজধানী, সর্বহারা জনগণের বৃহত্তর অংশের সমাবেশের-স্থান পিটার্সবুর্গে [বর্তমান নাম লেনিনগ্রাদ] চলে আসেন। তাঁর কর্মকেন্দ্র ছোট্ট শহর থেকে রাজধানীতে স্থানান্তরিত হলো।—পৃথিবীর সর্বহারার কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সে এক মহা সন্ধিক্ষণ।

২.

'ছোটখাটো তুচ্ছ কাজেও বিমুখ হযো না, কারণ
ছোটখাটো কাজ থেকেই গড়ে ওঠে বড় জিনিষ'—
এই-ই হলো লেনিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

পুলিশের খাতায় যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ভ্লাদিমির পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন ৩১শে অগাষ্ট। ওপর থেকে একটা আড়াল দেবার উদ্দেশ্যে ভ্লাদিমির সেন্ট পিটার্সবুর্গের আদালতে সহকারী ব্যরিস্টারের কাজ নিলেন। ভেতরে ভেতরে মার্কসবাদ চর্চার গুপ্ত চক্রে যোগ দিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে লেনিনের কাজের উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে গেল। এখানে ভ্লাদিমির তাঁর মার্কস-এর ওপর অর্জিত জ্ঞান, রাশিয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগের উপায় ও পথ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ব্যাখ্যা, বক্তব্যকে গুছিয়ে উপস্থিত করার কৌশল এবং স্ব-মতে লোক টানবার ক্ষমতা, তাঁকে অচিরেই মার্কসবাদের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতায় পরিণত করলো।

রাশিয়ার এই রাজধানীতে ভ্লাদিমির যখন কাজ সুরু করলেন,

ঠিক তখনকার রুশীয় শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। তা না হলে লেনিনের কৃতিত্ব বিচারে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যেতে পারে।

শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় য়ুরোপের অন্যান্য অংশের মতো রুশদেশেও পুঁজিবাদের বিকাশ হতে থাকে—এবং ফলে দেশের কলকারখানা ইত্যাদিতে ব্যাপকহারে শ্রমিক নিযুক্ত হতে থাকে। কিন্তু যন্ত্র-দানবের শোষণে শ্রমিকদের দুর্দশা ওঠে চরমে। দিনে বার থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা করে তাদের কাজ করতে হতো। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দারিদ্র্যের চাপে পড়ে এই সমস্ত শ্রম-সংস্থায় চাকরী নিতো—আর তাদের জানোয়ারের মত আট-দশ বা বারো ঘণ্টা করে কাজ করানো হতো। কিন্তু, এত পরিশ্রমের পর তারা যে মজুরী পেত তা দিয়ে জীবন-ধারণ করা ছিল একান্ত কষ্টকর। এর ওপর নানা অছিলায় সেই সামান্যতম মজুরী থেকেও বেশ কিছুটা অংশ কেটে নেওয়া হতো। এই সমস্ত শ্রমিকরা শুধুই বেঁচে থাকতো—কিন্তু সে বেঁচে থাকা পশুর থেকেও হীন। তাই মাঝে মাঝে তাদের মনে বিক্ষোভের ধূম ওঠে, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তৈরী হয় না।

হবে কি করে? কোন সংঘবদ্ধ দল তো নেই—সর্বহারাদের জন্যে তো পার্টি নেই—যারা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে এই বিক্ষোভকে এগিয়ে নিয়ে যাবে—'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা ফুটিয়ে তুলতে কে এগিয়ে আসবে?

কেন ঐ তো ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রয়েছেন! তিনি এগিয়ে এসে, এই সব বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে, বৈপ্লবিক পার্টি গড়ার কাজের দিকে মন দিলেন। এর মধ্যে আরও একটা কাজ তিনি করতে থাকলেন, তা হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে বিশ্বস্ত ও যোগ্য কর্মী খুঁজে বার করা, এবং তাদের বিপ্লবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। লেনিনের যে অদ্ভুত লোক চেনবার ও লোকের ক্ষমতা যাচাই করবার দক্ষতা ছিল, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিন্তু এই সব কাজে পুলিশ বা জারের শাসন ইত্যাদি বাইরের বিপদের থেকেও নারোদনিকবাদীদের উদারনৈতিক মতবাদের বিপদ অনেক বড় হয়ে দেখা দিল। লেনিন একদিকে যেমন বিপ্লব সংগঠনকে জোরদার করতে থাকলেন, তেমনিই বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর ঐ উদারনৈতিক মতবাদকে যুক্তি-তর্ক, এবং বিভিন্ন পুস্তিকার মারফত আক্রমণ করতে থাকলেন।

তিনি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'জনগণের বন্ধু কারা, এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের কৌশল কি?' —এই নামে একটা বই লিখলেন। এখানে তিনি দেখালেন যে এই উদারনৈতিক মতবাদীরা শোষকদের সঙ্গে আপোষ করে—অনেকটা নিবেদন-মূলক সংস্কারের পথ অনুসরণ করে পরোক্ষে জারতন্ত্রের এবং ধনী কৃষক [কুলাক]-দের স্বার্থ-ই রক্ষা করছেন। এ পথ মোটেই বিপ্লবের পথ নয়—এ পথে সর্বহারা সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি কখনই আসতে পারে না। এই বইতে তিনি আরও বললেন যে, বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই। অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর শোষিত অবস্থার সঙ্গে, কৃষকদেরও মিল রয়েছে—সে কথাও স্মরণে রাখতে হবে। অধিকন্তু বিচ্ছিন্নভাবে নয়—সমস্ত মার্কসবাদী চক্রকে একত্রিত হয়েই একটি সংঘবদ্ধ বিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হতে হবে।

লেনিনের এই বই নারোদনিকবাদীদের বিরুদ্ধে যেমন প্রচারের হাতিয়ার হলো—তেমনিই বিপ্লববাদীদের ও শ্রমিক শ্রেণীকেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করলো। এই বইটি 'হলদে খাতা' নামে পরিচিত ছিল। বেশী কপি ছাপাবার সুযোগ ছিল না বলে, সকলে দলবদ্ধ ভাবে এই বই পড়তো, ও সবাই তুমুল তর্ক এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে এর প্রতিপাদ্য বক্তব্যগুলোকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতো।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের মার্কসীয় বিপ্লবী পাটির বিরুদ্ধে তৃতীয় আর একটা শক্তির কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। তারা হলো বুর্জোয়া

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তৈরী জার সরকারের অনুমোদিত 'বৈধ মার্কসবাদী পার্টি'। নাম ও পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয় পেয়ে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এরা কারা ?—এই 'বৈধ মার্কসবাদী পার্টি, সব সময়েই বিপ্লব থেকে শত হাত দূরে থাকতো। এবং মার্কসতত্ত্বের আসল দিকগুলিকেই, যেমন—শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজবিপ্লব ও সর্বহারার একনায়কত্ব—অস্বীকার করতো। তবুও যেহেতু এরা নারোদনিকবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো, তাই ভ্লাদিমির কিছুটা পর্যন্ত তাদের সমর্থন জানাতো। কিন্তু তাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া স্বরূপটিকে প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

এই সঙ্গে প্রচণ্ড উৎসাহে শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের ভেতরে মার্কসবাদের তত্ত্বকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ব্যাপকহারে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে,—আগামী দিনের বিপ্লবী কর্মপন্থাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব যারা নিতে পারবে, তেমনি সব কর্মী বাছাই ও তৈরী হচ্ছে—মার্কসীয় তত্ত্ব ও তা কার্যকরী করতে শ্রমিকদের কর্তব্য কি হবে, তা বিশ্লেষণ ও বিচার করে পুস্তিকা—প্রবন্ধ, রচিত হচ্ছে—এবং সর্বোপরি মার্কসবাদী পার্টি তৈরীর কাজও ভ্লাদিমির করে চলেছেন। পাঠকদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে—এ সমস্ত কাজই চলছিল জারের পুলিশকে যতটা সম্ভব লুকিয়ে।

ঠিক এই কর্মযজ্ঞের অধিবাসলগ্নে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রবিবাসরীয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নাদেজদা কনস্তানতিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে লেনিনের পরিচয় হয়। এই বিদ্যালয়টি ছিল নেভস্কি জেলায়। প্রধানত ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরাই ঐ বিদ্যালয়ে পড়তে আসতো। ক্রুপস্কায়া ও লেনিনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হলো, এবং কাজের পথ ধরে হাঁটতে গিয়ে দু-জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও হলো। এবং এই ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরেই উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অবশ্য সে কথা কিছুদিন পরের।

ভ্লাদিমিরের সহজ মধুর ব্যবহার—শ্রমিকদের অবস্থার প্রতি

সজাগ ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি এবং তাদেরকে মার্কসবাদের সঠিক তত্ত্বগুলো সহজ ভাবে ও বোধগম্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার ফলে, শ্রমিকেরা অধিক সংখ্যায় তাঁর কাছে আসতে থাকে। তাঁর প্রচারিত মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকে। তিনি এমন সোজা করে সমস্ত বিষয়কে, এই সব শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষদের কাছে উপস্থিত করতেন, যাতে করে কারুর মনে কোন ধোঁকা থাকতো না। যেমন শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের তুলনা করতে গিয়ে ভ্লাদিমির 'সিংহের শিকার' নামে রুশদেশে অতিপরিচিত একটা গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'কারখানায় চালু অতিরিক্ত খাটুনির নতুন নিয়মটার সঙ্গে, সিংহের শিকার ভাগের গল্পটা বড় বেশী করে মনে পড়ে। যেমন, প্রথম ভাগটা সে নিলো। তারপর দ্বিতীয় ভাগটাও নিল—যেহেতু সে পশুর রাজা। তৃতীয় ভাগটাও তার, যেহেতু সে সবচেয়ে শক্তিমান। আব চতুর্থ ভাগটার দিকে যে হাত বাড়াবে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। ধনী মালিকরা ঠিক এই নীতিতেই শ্রমিকদের ওপর তাদের শোষণ ও পীড়নের যুক্তিটা খাড়া করে তোলে।'

এই ধরণেব প্রচার ও ব্যাখ্যা এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে ভ্লাদিমির নিজেকে বিপ্লবী চক্রগুলির পক্ষে অপরিহার্য কবে তুললেন। শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেবে, তাদের সংগঠক রূপে এবং তাদের মার্কসবাদের সঠিক পথে পরিচালনা কবে, সকলের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। এই সময়ে লেনিন আরও একটা জিনিষ উপলব্ধি করলেন যে—য়ুরোপের আরও বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত শ্রমিক রয়েছেন, তাদের যে সমস্ত সংগঠন রয়েছে, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা দরকার—তাদের কাজকর্মেব ধারা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন; এবং রুশ দেশের মার্কস-বাদীদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কি না, তার একটা চেষ্টা করা।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিন

প্রথমে জেনেভায় গিয়ে প্লেখানভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে রুশ দেশের শ্রমিকদের অবস্থা, সেখানকার মার্কসবাদী চক্রগুলির কাজকর্ম, এবং অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকে কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায় ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেন। এই সমস্ত আলোচনা থেকে প্লেখানভের ভ্লাদিমির সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা হয়। তিনি এক চিঠিতে লেখেন যে এর আগে তিনি কখনই এরকম একজন রুশীয় তরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, যে সমস্ত দিক থেকেই তুলনাহীন। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জানানো যেতে পারে যে, এই প্লেখানভ হচ্ছেন প্রথম উল্লেখযোগ্য রুশী মার্কসতত্ত্ববিদ্। জার পুলিশের উৎপাতের জন্যে তিনি বিদেশ থেকে কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন।

ভিয়েনায় প্লেখানভের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে ভ্লাদিমির প্যারিসে যান। সেখান থেকে যান বার্লিনে। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তাদের সভায় অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও বিস্তারিত ভাবে মার্কসবাদের আলোচনা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্ম সম্পর্কেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করতেন।

লেনিনের জীবনের এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ এক বিরাট তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছিল। যার ফল, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর জীবনাচরণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই ভ্রমণের সময়েই প্যারিসের প্রখ্যাত বিপ্লবী, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী এবং মনীষী মার্কসের জামাতা পল লাফার্গের সঙ্গেও তাঁর দেখা-পরিচয় হয়। তাঁর আরও ইচ্ছে ছিল যে, সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলবার মতবাদ প্রচারের জনক এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মহাগুরু, মার্কসের একান্ত সহযোগী ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সঙ্গেও দেখা করে আসেন। কিন্তু তিনি ভীষণ ভাবে অসুস্থ থাকায় লেনিনকে

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। একলব্যের মত, মানস-লোকে গুরুর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেই, লেনিনকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে বলেই বোধ হয় এমনটি হলো।

এই ভ্রমণের সময় ভ্লাদিমির হাতে যতটুকু অবসর পেতেন তা কখনই নষ্ট করতেন না। ঐ সকল দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরীগুলিতে গিয়ে মার্কসীয়-তত্ত্ব বিষয়ে নানারকমের বই পড়ে নিতেন। এসব বই সাধারণতঃ রাশিয়ায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এই রকমের বই রাশিয়াতে নিয়ে ঢোকাও সম্ভব ছিল না—তাই তিনি প্রাণ ভরে নানা বিষয়ের বইগুলি পড়ে—স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাশিয়ার পথে পাড়ি দিলেন।

একটা আগের কথা এখানে বলতে ভুলে গেছি। এখানে সেটা বলে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে লেনিনের এই বিদেশ যাত্রার পেছনের কারণটা বোঝা যাবে না। ব্যাপারটা হলো এই যে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে মস্কো, কিয়েভ, ভিল্‌নো এবং সেণ্ট পিটার্স-বুর্গের প্রতিনিধিরা যোগদান করে। সেখানে আলোচিত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যৎ কমিউনিষ্ট বিপ্লবী কর্মধারার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার প্রথমটি হচ্ছেঃ আর ছোট ছোট আলোচনাচক্রের মধ্যে মার্কসবাদকে সীমাবদ্ধ না রেখে, ব্যাপক ভাবে প্রচারের পথে ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের দিকে এগুতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ জনপ্রিয় মার্কসীয় সাহিত্য প্রচার করতে হবে। তৃতীয়টি হলোঃ অন্যদেশের মুক্তিকামী শ্রমিক সংঘগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এখান থেকে আরও একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, একটা প্রতিনিধি দলকে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলবার জন্যে, বিদেশে পাঠানো হবে। মতের মিল না হওয়ায় শেষেরটি যথাযথভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। তাই মাত্র দু-জন—সেণ্ট পিটর্সবুর্গ থেকে ভ্লাদিমির এবং

মস্কো থেকে স্পনৃটি,—বাইরে গিয়েছিলেন।

ঐ বছরেরই শরৎকালে [সেপ্টেম্বরের গোড়ায়] লেনিন দেশে ফিরে এলেন। অবশ্য সোজা পিটার্সবুর্গে ফিরলেন না। ফিরলেন—ভিলনো, মস্কো, অরেখভো জুয়েভো হয়ে। উদ্দেশ্য ঐসব জায়গায় বিপ্লবী মার্কসবাদী কর্মীদের [সোশ্যাল ডেমোক্রাট নামে তখন এরা পরিচিত ছিল] সঙ্গে যোগাযোগ করা—খবর দেওয়া-নেওয়া। বিদেশ থেকে ফেরাব সময় লেনিন একটা ভাঙ্কর কাজ করেন। তিনি জাবেব পুলিশেব চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর স্যুটকেশের নীচের একটা গোপন জায়গায় করে কিছু মার্কসীয় বইপত্তর নিয়ে আসেন। পুলিশেব ওপব কড়া নির্দেশ ছিল যে লেনিন বাইরে থেকে কোন বকম মার্কসীয় বই নিয়ে ঢুকতে যেন না পারে। তাই লেনিনেব এই গোপনীয়তা।

বাশিয়াব মস্কো প্রভৃতি কয়েকটা অঞ্চল ঘুবে, তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরে আসার পর যে ঘটনাটি ঘটলো, তা বোধ হয় সমগ্র রুশীয় বিপ্লবী কর্মী সঙ্ঘের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। সমস্ত ছোট ছোট মার্কসীয় চক্রগুলিকে—যা এতদিন রাশিয়ার বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করছিলো—একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হলো ঃ 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘ' [The League of Struggle for the Emancipation of the Working Class]—সংক্ষেপে 'সংগ্রাম সংঘ' [১৮৯৫, সেপ্টেম্বর]। এই সংঘেব পবিচালনার দায়িত্ব ভার ন্যস্ত ছিল ক্রুপস্কায়া, ভানেয়েভ, জাপরজেৎস, রাদচেস্কো, পত্রেসভ প্রমুখের ওপর।

সংঘ তো প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু তার কাজ-কর্ম, পরিচালনধারা কি হবে? যোগ্য নেতা—দূরদর্শী নায়ক, লেনিন এ বিষয়ে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করলেন। তিনি এই সংঘের ভিত্তি হিসেবে সচল রাখলেন বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকচক্রগুলিকে; সঙ্গে স্থানীয় গ্রুপগুলিকে নিয়ে তৈরী 'লোকাল কমিটি' [স্থানীয় সমিতি]-র কাজও চলতে থাকলো। কিন্তু সংঘের কেন্দ্রের

সঙ্গে প্রতি স্তরে রইলো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের দৃঢ় নির্দেশ এবং নিয়ম-নিষ্ঠা। কিন্তু এই শৃঙ্খলা পালনের মধ্যে দিয়ে কারও মতামতকে অগ্রাহ্য বা ছোট করে দেখানো হতো না। এবং রিপোর্টিং প্রথার মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান ও তার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হতো। এই ভাবেই একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের আশ্রয়েই রাশিয়ার বিপ্লবী মার্কসবাদী পার্টির ভ্রূণ সঞ্চার হলো—শ্রমিক আন্দোলনের হাতিয়ার নিয়ে, সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামকে সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, তথা রাশিয়াই প্রথম এগিয়ে এলো।

এই 'সংগ্রাম সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লেনিনেরও কর্মযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেলো। তাঁরই নির্দেশে এই সংঘের মারফৎ শ্রমিকদের আন্দোলন ভাষা পেতে থাকলো—একটা সুষ্ঠু কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া অভাব-অভিযোগগুলি প্রচারিত হতে থাকলো, মালিক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণের ক্ষেত্রগুলির স্বরূপকে উন্মোচিত করে দেওয়া হতে থাকলো। এই কাজের জন্যে নানা বিষয়ের, অনেক অনেক প্রচারপত্র বিলি করা হতে থাকলো। এবং উদ্যোগ চলতে লাগলো, 'রাবোচেই দিয়েলো' [Robocheye Dyelo—'শ্রমিকদের লক্ষ্য'] নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের। কিন্তু এই সংবাদপত্রটি শেষ পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি।

এর মধ্যে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'থোর্নটোন কারখানায়' ৫০০ জন শ্রমিকের একটি সফল ধর্মঘট হয়। যার নেতৃত্ব ছিল মূলত 'সংগ্রাম সংঘে'র হাতে। এই ধর্মঘটকে সফল করতে লেনিনের লেখা বেশ কয়েকটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। অভিনব অভিজ্ঞতায় মোড়া এই ধর্মঘট সফল হলো—শ্রমিকদের জয় হলো। আর তার ফলে 'সংগ্রাম সংঘে'র নাম ও প্রতিষ্ঠা সেন্ট পিটার্সবুর্গের সর্বত্র—এবং সেখান থেকে সারা রাশিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। 'থোর্নটোন কারখানা'র ধর্মঘটের ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ সারা রাশিয়ায় দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। মস্কো, কিয়েভ, তুলা,

ইয়ারোশ্লোভল এবং আরও অনেক জায়গায় নানা শ্রমিক সংগঠন তৈরী হতে থাকে—তারা সবাই লেনিনের নেতৃত্বাধীন 'সংগ্রাম সংঘে'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ও মতামত বিনিময় করে চলতে লাগলো। এই ভাবে সমগ্র রাশিয়ায় ধীরে ধীরে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামে লেনিনীয় মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা হতে থাকলো—মার্কসবাদের উত্তরসাধক, লেনিনবাদের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকলো।

কিন্তু অন্যদিকে জারের পুলিশও চুপ করে বসে থাকলো না। সুতাকলের ঐ ধর্মঘটের ফলে তাদের টনক নড়ে উঠলো। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৮'ই ডিসেম্বরের রাত্তিরে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে লেনিন সমেত দলের অনেককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ফলে 'রাবোচেই দিয়েলো'—প্রায় প্রস্তুত প্রথম সংখ্যার সবই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। 'শ্রমিকের লক্ষ্য' এই ভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

ভ্লাদিমির বন্দী হলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জেলখানার এক নির্জন কক্ষে তাঁকে রাখা হলো। প্রায় চোদ্দ মাস তিনি এই একক কক্ষে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এই কষ্ট তাঁকে আদৌ দমিয়ে দিতে পারে নি। জানালা-দরজা বন্ধ ঘরে প্রদীপ শিখা যেমন নিষ্কম্প হয়ে আরও বেশী উজ্জ্বলভাবে আলো বিতরণ করে, ঠিক তেমনিই এই নির্জন-বন্ধ জেলখানায় লেনিনের জ্ঞান-প্রদীপ ও কর্মশিখা আরও একান্তভাবে, আরও তন্নিষ্ঠ হয়ে জ্বলে উঠলো। নানা ফন্দি-ফিকির করে 'সংগ্রাম সংঘ'কে কর্মনির্দেশ পাঠাতেন তিনি। বাইরের কর্মীদের কাছে চিঠি-পত্তর দিতেন, পুস্তিকা বা প্রচারপত্র রচনা করেও পাঠিয়ে দিতেন।

জেল-পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা মজাদার উপায়ে তিনি বাইরের কর্মীদের এইসব উপদেশ পাঠাতেন—যেমন, অমুকের জন্যে গরম কাপড় যোগাড় করে পাঠিয়ে দাও। তমুকের জন্যে একটা পাত্রী ঠিক করে ফেল। অমুক কর্মীট যেন একা না থাকে, ঐ মেয়েটিকে বলো, মাঝে মাঝে সে গিয়ে যেন দেখা করে আসে।

এই রকম আর কি !

জেলে বসে, তিনি কিভাবে গোপন নির্দেশ ও দলিল-পত্রাদি বাইরে পাঠাতেন ? এখানে তার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক : 'লেনিন বাইরে পাঠাবার জন্যে যে সব বিপ্লবী দলিল পত্র লিখতেন —তাতে কালি হিসেবে ব্যবহৃত হতো দুধ। তাঁর কাছে যে সব বই, পত্র-পত্রিকা আসতো তার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে লিখতেন। খালি চোখে এ সব লেখা চোখে পড়তো না—কিন্তু কাগজটা আগুনে ধরলেই লেখাগুলি বেশ ফুটে উঠতো। বাইরে থেকেও এই ভাবেই তাঁর কাছে খবরাখবর এসে পৌছাতো।

'দুধ তো কালি হলো। পাঁউরুটি দিয়ে দোয়াত বানানো হতো। আর যেই জেলখানার কর্তৃপক্ষ এসে পড়তেন তখনই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা গিলে ফেলতেন। এই রুটি খাওয়া নিয়ে রসিকতা করে লেনিন একটা চিঠিতে লিখেছিলেন যে, আজ ছটা দোয়াত খাওয়া হলো।'

আগেই বলেছি যে, এই জেল-বাস লেনিনের পক্ষে সাধন-ক্ষেত্র। এ কথা যে কতখানি সত্য তা এই জেলখানায় বসে আরম্ভ করা তাঁর 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' [*The Development of Capitalism in Russia*] গ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যাবে। এখানেই এই বইটির রচনা কালের সুরু হয়। রাশি রাশি বই-পত্র পত্রিকা পড়বার দরকার হয় এটা লেখার জন্যে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নানাগ্রন্থ পাঠ করে তিনি এই মহান বইটি রচনা করেন। এই সব বই-পত্তর তাঁকে সরবরাহ করতেন তাঁর বড়দি আন্না ইলিনিচনা।

শুধু পড়াশুনা—বিপ্লবী কাজকর্মের নির্দেশ ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে জেলখানার নিরালা কক্ষে বসে ভ্লাদিমির কেবল মাথার পরিশ্রমই করতেন না—শরীরটাকে পোক্ত রাখবার জন্যে রোজ রাত্রে ঘুমাবার আগে খালি হাতে ব্যায়াম করতেন। এইভাবে শরীর ও মনকে শক্ত করে নিয়ে তিনি আগামী বিপ্লবী যুদ্ধের জন্যে নিজেকে

তৈরী করে নিতে লাগলেন। সহযোগী কর্মীদেরও তাঁর স্ব-আচরিত কর্মপন্থা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিতেন। লেনিনের জীবনের এই অংশটুকু পৃথিবীর সব দেশের খেটে খাওয়া মানুষ ও তাঁদের নেতৃবৃন্দের পক্ষেই বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়।

৩.

'...লোকে যখন আমাদের কাছে নৈতিকতা সম্পর্কে বলে, আমরা বলি : একজন কমিউনিষ্টের কাছে এক ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলাবোধ এবং শোষকদের বিরুদ্ধে সচেতন গণসংগ্রামই হলো নৈতিকতা।'

'যুব সংগঠনগুলির কর্তব্য' : লেনিন

প্রায় চোদ্দ মাস সেণ্ট পিটার্সবুর্গের জেলখানায় বন্দী থাকবার পর ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিন বছরের জন্যে ভ্লাদিমিরকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হলো—শুশেনস্কোয়ে নামে সাইবেরীয় অঞ্চলের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এই গ্রাম ছিল একেবারেই আধুনিক সভ্যতার স্পর্শবঞ্চিত। সেদিন এই জায়গাটা যে কি রকম ভয়ঙ্কর ছিলো তা আজকের মানুষ শুনলে শিউরে উঠবে। রেলপথে মস্কো থেকে ক্রাস্নোইয়ারস্ক পৌছাতে লেনিনের লেগেছিল দশদিন। তারপর সেই জায়গায় তাঁদের প্রায় দু-মাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়, বরফ গলার জন্যে। বরফ গললে নৌকায় করে একসপ্তাহ চলার পর পৌছানো গেল সাইবেরিয়ার প্রান্তসীমার গ্রাম মিনুসিনস্কতে। সেখান থেকে বন্দুকধারী পুলিসের সঙ্গে তাঁদের প্রায় শত শত মাইল রাস্তা ঘোড়ার গাড়ী করে যেতে হয়। শেষে প্রায় আড়াই মাস পরে তাঁরা নির্বাসন স্থান, শুশেনস্কোয়েতে পৌছান। তাঁরা যাত্রা করেছিলেন ২২শে ফেব্রুয়ারী এবং ঐ গ্রামে পৌছান ৮ই মে।

এই পরিবেশে এসে প্রথমটা ভ্লাদিমির বেশ খানিকটা অস্বস্তি-তেই পড়েন। কারণ সভ্যজগত থেকে অনেক দূরে, এই গণ্ডগ্রামে

এসে প্রথমটা, তিনি যে কি করবেন তা ভেবেই পেলেন না। প্রথমে একটা শ্লথ ও অলস মন্থরতায় নির্বাসনের বছর ক-টাকে কাটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন তিনি। কিন্তু এভাবে কদিনই বা থাকতে পারেন তিনি। কারণ তাঁর মত—বিপ্লবের জাগ্রত চেতনায় পরিপূর্ণ, সদা স্ফূর্তিমান, কর্মোদ্যমে নিয়ত-চঞ্চল এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপূর মানুষ দীর্ঘদিন 'এমনি করে যায় যদি দিন, যাক্ না'—ভাবে তো কাটিয়ে দিতে পারেন না। এবং তিনি পারলেনও না। যদিও এখান থেকে তাঁর বাইরের জগতের— কর্মময় বিপ্লবীচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুবই কষ্টকর হলো; তবুও যে পরিবেশ তিনি রচনা করে দিয়ে এসেছেন; যে মতাদর্শের অনুসরণকারী বিরাট এক কর্মী, সহকারী ও সমভাবুক-গোষ্ঠী নির্মাণ করে এসেছেন, তাদের সঙ্গে তিনি অচিরেই যোগাযোগ গড়ে তুললেন। সেই কঠোর নির্বাসন ক্ষেত্র থেকে য়ুরোপীয় রাশিয়ায় চিঠিপত্র যেতে বা আসতে পনের দিনেরও বেশী সময় লাগতো। তা-ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশ অনেক চিঠি-পত্তর দিতও না—ফেলে বা কেটে-ছেঁটে দিত। কিন্তু আশাবাদী ও দৃঢ় প্রত্যয়বদ্ধ লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্য অন্য শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। নানাভাবে তাঁদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি, অন্যান্য যারা সাইবেরীয়ার সেই নির্জন অঞ্চলে ও তার আশেপাশে নির্বাসিত হয়ে ছিল তাদের সঙ্গেও বিভিন্ন পন্থায় আলাপ-আলোচনা সুরু করলেন। সকলকেই তিনি জানালেন যে তিনি আছেন—তাঁদের মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহিত করতে লাগলেন: "বন্ধুগণ আপনারা ভেঙ্গে পড়বেন না। শত্রুর সঙ্গে সাহস নিয়ে মোকাবিলা করুন। আর মনে মনে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করুন যে, 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে'।"

ভ্লাদিমির পড়াশুনা করা, চিঠিপত্তর লেখা, বৈপ্লবিক কাজের নির্দেশ বা পথ-পরিচয় দেওয়া, পুস্তক বা পুস্তিকা রচনা করা ইত্যাদি

কাজের সঙ্গে সঙ্গে, যে গ্রামে নির্বাসিত হয়েছিলেন—সেইখানকার অবস্থা, কৃষিজীবী লোকগুলির অবস্থা অত্যন্ত আগ্রহ ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাদের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে থাকবার চেষ্টা করতেন। নানাভাবে তাদের সাহসও দিতেন। তারাও তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিলো। বুঝতে পারলো যে এ লোকটা প্রকৃতই তাদের বন্ধু।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে যাতে তিনি গ্রামের দরিদ্র-সরল মানুষগুলোর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির আরো কাছাকাছি চলে আসেন। তিনি সোনার খনির এক মজুরকে তার মালিকের সঙ্গে মামলায় জিততে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তার পরই তাঁর নাম সু-বিচারক হিসেবে, ভালো উকিল হিসেবে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এর পর থেকেই গরীব চাষী-মজুরেরা প্রায়ই তাঁর কাছে আসতে থাকতো—অভাব-টভাবের কথা জানাতো, সাহায্য চাইতো এবং তিনি সাধ্যমত সাহায্যও করতেন। এই সময়কার গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর কাজ সম্বন্ধে তিনি অনেক পরে তাঁর এক স্মৃতিচারণায় বলেছেন: 'যখন আমি সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছিলাম, তখন আমার সেই পুরানো ওকালতি বিদ্যেটা ঝেড়ে-ঝুড়ে আবার কাজে লাগাতে হয়েছিল। আমি একাধারে গ্রাম্য উকিল ও ব্যক্তিগত ঝগড়া-কোন্দলের বিচারক ছিলাম। অবশ্যই এটা লুকিয়েই করতে হতো—কারণ নির্বাসিত ও সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রশাসনিক ভাবে আমি এসব করতে পারি না। তবে আমার মত আর কেউ যখন তাদের ধারে কাছে ছিল না, তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমিই তাদের আশ্রয় হয়ে উঠেছিলাম'। কিন্তু তাদের উপকারের বিনিময়ে লেনিন কি কিছুই নিতেন না? হ্যাঁ নিতেন বইকি? নিতেন তাদের হৃদয়-মন। নিতেন তাদের ইচ্ছা—ধনী, স্বৈরাচারী লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ইচ্ছা।

এইভাবে প্রায় এক বছর কাটাবার পর, 'সংগ্রাম সংঘে'র একটা মামলায় নির্বাসন দণ্ড পেয়ে তিন বছরের জন্যে সাইবেরিয়ার ঐ

শুশেনস্কোয়ে গ্রামে এসে—হাজির হলেন ভ্লাদিমিরের কর্মসঙ্গিনী নাদেঝ্‌দা ক্রুপস্কায়া—জীবন সঙ্গিনী হতে। সঙ্গে তাঁর মা ভেসিলেভনা-ও এলেন। অবশ্য ক্রুপস্কায়ার নির্বাসন দণ্ডের স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল উফা গুবের্ণিয়ায়। কিন্তু তিনি যেহেতু লেনিনের বাগ্‌দত্তা ছিলেন সেই জন্যে তিনি রাজ-সরকারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁর নির্বাসনের স্থান গুবের্ণিয়া থেকে শুশেনস্কোয়েতে স্থানান্তরিত করা হয়। লেনিনও তাঁর পক্ষ থেকে রাজ-সরকারকে অনুরূপ আবেদন করেন। তাঁদের উভয়ের আবেদন মঞ্জুর হয়।

আমরা আগেই বলে এসেছি যে, পিটার্সবুর্গে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার সময়ে শ্রমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে লেনিনের ঘনিষ্ঠতা হয়। উভয়ে উভয়ের অন্তরকে চিনে নেন। বৈপ্লবিক পথের যাত্রী হিসেবে দু-জনে দু-জনের কাছাকাছি আসায় উভয়ের মধ্যে যে পরিচিতি ঘটেছে,—তা হয়তো কিঞ্চিৎ ভাবাবেগের মধ্যে দিয়ে প্রেমে পরিণত হয়েছে। এবং সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে—অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের যে বৈপ্লবিক আগুন জ্বলেছিল তাকেই সাক্ষী রেখে এই হৃদয় দেওয়া-নেওয়া ঘটেছিল। তাঁরা বিপ্লবী বা মার্কসবাদী ঠিকই—কিন্তু মানুষও তো বটে।

তাই ক্রুপস্কায়ার গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা দিতে সেন্ট পিটার্সবুর্গের জেলখানায় থাকতেই অদৃশ্য কালিতে লেনিন চিঠি দেন। ক্রুপস্কায়া তার যে উত্তর লেখেন সেটা বোধহয় পৃথিবীর এক অপূর্ব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্র। পরবর্তী জীবনে ক্রুপস্কায়ার এই অদ্ভুত, মজাদার ও সংযত প্রেমপত্রের কথা প্রায়ই লেনিন পরিহাস-ছলে উল্লেখ করতেন। ক্রুপস্কায়া লিখেছিলেন: 'বেশ, যদি স্ত্রী, তখন স্ত্রী-ই হবো' ['Well, if wife, then wife let it be.']।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের গোড়ার দিকে ক্রুপস্কায়া শুশেনস্কোয়ে এসে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। গ্রামের লোকগুলি জিরানোভের কুঁড়ের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে এই

নতুন অতিথিকে দেখতে লাগলো। রোগা রোগা চেহারা এবং মোটা বিনুনী করা লেনিনের প্রণয়িণী এই মেয়েটিকে তারা যেভাবে দেখতে লাগলো তাতে মনে হতে থাকে যে, তারা আগে আর কোনো দিন এমন মেয়ে দেখেনি।

ক্রুপস্কায়া এসে পৌঁছাবার পরেই পুলিশ থেকে জোর তাগাদা দেওয়া হতে থাকে যে, তোমরা যদি শীঘ্রি বিয়ে করে না ফেলো ঃ তবে ক্রুপস্কায়াকে উফাতে সরিয়ে রেখে আসা হবে। কিন্তু তবুও ঐ বছরের ১০ই জুলাই তারিখের আগে—ক্রুপস্কায়া এসে পৌঁছাবার দু-মাসের মধ্যে কিছুতেই বিয়ে করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই ভাবে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের স্ত্রী হিসেবে, ক্রুপস্কায়া অত্যন্ত বিশ্বস্ততার ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। লেনিন আরও বেশী করে প্রেরণাময় হয়ে, বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেন।

এই নির্বাসন জীবনেও লেনিন কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁর পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন ও লেখা চালিয়ে যান। তিনি মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা আরও গভীর ভাবে খুঁটিয়ে পড়তে থাকেন। তাঁদের লেখা-গুলিকে প্রয়োজন মত রুশ ভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। রাত গভীর হলে সমস্ত গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়তো, তখনও লেনিনকে দেখা যেত যে তিনি পড়ছেন বা লিখছেন। ফলে নির্বাসনের তিন বছরে তিনি প্রায় ত্রিশটি বই লিখে ফেললেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য যেটা সেটা হলো, 'রুশীয় সোশাল ডেমোক্রাটদের কর্তব্য' [*The Task of the Russian Social Democrats*] এছাড়াও সেন্ট-পিটার্সবুর্গ-এর জেলখানায় থাকতে 'রুশীয় পুঁজি বাদের বিকাশ' বলে যে বইটির রচনা আরম্ভ করেন তাও এখানে বসেই শেষ করে ফেলেন। এই দুটো মহান কাজের ফল উত্তরকালে রুশদেশের গঠন কার্যে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

এই নির্বাসন কালে তাঁর আর একটি বড় কাজ হলো, পার্টির খসড়া কর্মসূচী তৈরী করা। কারণ, পার্টি হয়েছে, তার কাজকর্ম ক্ষুদ্র আলোচনা-চক্রের গণ্ডী ছেড়ে বৃহত্তর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে

অগ্রসরও হচ্ছে, তাই তার কর্মসূচী চাই। কোন পথ ধরে এবং কোন কোন কাজের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সে পৌঁছাবে তার একটা পরিষ্কার ছবি চাই। সেই সব দিকে লক্ষ্য রেখেই এই কর্মসূচী তৈরী করা হলো।

আগেই আমরা বলে এসেছি যে, অনেক সময় ধরে—অনেক পরিশ্রম করে, আর নানা বিষয়ে পড়াশুনা করে লেনিন 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' বইটি লেখেন। এটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৯-এর মার্চে। এতে লেনিন একটা ছদ্মনাম ['ভ্লাদিমির ইলিন'] ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই বইটা বোধ হয় তেমন বিক্রি হবে না। কিন্তু ২,৪০০ কপির প্রথম সংস্করণ হু হু করে কেটে গেল। এ-প্রসঙ্গে এই বইটা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন; কারণ, এই বইটা পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা এবং তার পরিণামকে সুফলপ্রদ করে তুলতে বিশেষ ভাবেই সাহায্য করেছিল। তাই এই বই-এর প্রসঙ্গে কিছু না বললে লেনিনের জীবনী রচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই বইটির বক্তব্য নারোদনিক এবং 'আইনী মার্কসবাদী'দের মুখে চপেটাঘাতের মত গিয়ে পড়লো। যার পরিণাম নারোদবাদের কবরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ। মহামনীষী কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' বইতে যে তত্ত্ব রয়েছে, তাকেই রুশীয় অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ফেলে লেনিন নতুন বক্তব্যে হাজির হলেন—এ যেন ভগীরথের তপস্যার দ্বারা বিষ্ণু কমণ্ডলুধৃত গঙ্গাকে মানব-সমাজের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে দেওয়া। ধনিক শ্রেণীর পুঁজিবাদ সৃষ্ট সমাজের মধ্যেকার বিরোধ এবং তাদের কারণ—ক্ষেত্র, ও তাদের স্ফীতকায় চেহারার মধ্যেকার দুর্বলতাসমূহ—তিনি দেখিয়ে দেন; এবং অন্যদিকে তিনি আলোচনা করে দেখান যে, খেটে খাওয়া মানুষগুলো কি ভাবে বঞ্চনার মধ্যে থেকেও প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করছে। তিনি এখানে আরও দেখান যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রামকে বিজয়ী করবার জন্যে কলে-কারখানার খেটে খাওয়া দরিদ্র শ্রমিক,

আর ক্ষেত্র-খামারের সর্বরিক্ত কৃষককে এক হতেই হবে এবং একই সঙ্গে হাতিয়ার ধরতে হবে। তবে, যেহেতু, শ্রমিকেরাই সরাসরি এবং বেশী পরিমাণে আঘাত পায় ও শহরে থেকে অনেক বেশী পোড় খেয়েছে—তাই এই লড়াইতে তাদেরই প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে। সর্বহারার দল গড়ার মূল তাৎপর্য, তাদের কাজকর্মের ধারা এবং তাদের লড়াই করার কৌশল, বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরী করার কাজে এই বইটি থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। তাই আগেই বলছিলাম যে, এই বইটা রাশিয়ার বিপ্লবের কাজে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছে।

আজ সর্বত্র যেমন দেখা যাচ্ছে যে, সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষ থেকে—একদিকে যেমন শোধনবাদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে তেমনি মতান্ধ হঠকারীদের বিরুদ্ধে, তীব্র লড়াই করবার ডাক দেওয়া হচ্ছে, লেনিনের সময়েও শোধনবাদ এবং হঠকারিতার বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম করতে হয়েছে—এর সংগে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই তো আছেই।

যেমন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতা—মিস্টার এডুয়ার্ড বের্ণস্টাইন এবং আরো কেউ কেউ শ্রমিকদের বিক্ষোভ এবং তার ফলে ধর্মঘটে সামিল হওয়া ইত্যাদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোষের পথে ঠেলে দিচ্ছিলো। তারা শ্রমিকদের বোঝাচ্ছিল যে, তোমাদের তো খাওয়া-পরা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির অসুবিধা—যদি লড়াই করে তার কিছু কিছু আদায় করে নেওয়া যায় বা মালিক-শ্রেণী তা স্বেচ্ছায় দেয়, তবে আর তাদের উৎপাত করা কেন ? বড়লোক বুর্জোয়ারাও থাকুক—আর তোমরাও থাক।

এই আপোষমূলক মনোভাবের মধ্যে লেনিন ভয়ঙ্কর বিপদ দেখতে পেলেন। তিনি বুঝলেন যে এতে করে তাদের সংগ্রামী মনোভাব ভোঁতা হয়ে যাবে। তিনি প্রায় সুচনাতেই এই মনোভাবকে আক্রমণ করলেন—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে লিখলেন 'রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রতিবাদ' এবং ঐ প্রতিবাদের নিচে যে জায়গায়

লেনিন নির্বাসিত হয়েছিলেন সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত আরও সতের জন মার্কসবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের সই করে তা জেলখানার বাইরে যে সব কমরেড রয়েছেন তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই প্রতিবাদ দলিলে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়—শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন পার্টি গঠন এবং শোষণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তার কঠিন ও আপোষহীন সংগ্রামের বিষয়ে। এই ভাবে—এই নির্বাসনের সময়েই লেনিন রাশিয়ায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলবার পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেন। তাই দেখি যে নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে নতুন ধরণের মার্কস-বাদী পার্টি তৈরীর কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিযোগ করেছেন।

লেনিন তাঁর তিন বছরের নির্বাসন কালে লেখাপড়া ইত্যাদি গুরুত্ব-পূর্ণ পরিশ্রমের মধ্যেও আমোদ-প্রমোদ, গান-ভ্রমণ ইত্যাদি—কিছু থেকেই নিজের দেহ-মনকে বঞ্চিত রাখতেন না। তিনি নির্বাসনের একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্যে ও শরীরটাকে সতেজ-তাজা রাখবার জন্যে বরফের ওপর স্কেট করতেন। শিকারে যেতেন। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, আশে পাশে, কখনও বা বেশ দূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। শুশা নদীর তীরে তীরে, ঝোপঝাড়ের ছায়ায় ছায়ায়, বেড়িয়ে বেড়াতে তিনি খুবই ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে আশে-পাশের গ্রামে নির্বাসিত কমরেডরা যখন তাঁর কাছে আসতো, বা তিনি যখন তাঁদের কাছে যেতেন, তখন আলোচনা—তর্ক অথবা গান-পান-ভোজনে সেই সময়টা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠতো। আমরা দেখে এসেছি যে, ছোটবেলায় তিনি তাঁর বাবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, ভায়েদের সঙ্গে যে গানের চর্চা করতেন—এখানেও তেমনি 'গুরুতর স্বাধীনতায় হীনতায় পঙ্গু,' 'তুষমণি ঝঞ্ঝা' অথবা 'মাভৈঃ কমরেড, খাড়া হও, তৈরী হও।' ইত্যাদি বিপ্লবী সঙ্গীতের আসর বসতো। সঙ্গীতের মধ্যে সব কমরেডরাই জীবনটাকে তাজা করে নিতেন।

লেনিন অবিশ্রান্তভাবে প্রচুর চিঠি লিখতেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, কর্মী সবাইকে তিনি চিঠি দিতেন—চিঠিতে কাজের নির্দেশ

দিতেন—উঠে দাঁড়াতে, জীবনে সাহস-ধৈর্য-আশা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করতেন। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। যিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে জেলখানা—জেলখানা থেকে সুদূর সাইবেরীয়ার গ্রামে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করছেন সেই ব্যক্তি কি ভাবে এমন চিঠি লিখতে পারেন; আশা ও আশ্বাসে ভরা এমন সমস্ত কথা লোকের মনের উৎসাহকে চাঙ্গা করে তুলতে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর লেখা এই সমস্ত চিঠি ও উপদেশাবলীগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিনের বড়দি আন্না এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে: 'ইলিচের চিঠিগুলি পেলে মনে হতো যেন তা উষ্ণ কপালে স্নেহময়ী মাতার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। সবকিছু বিষণ্ণতা, সমস্ত জ্বালা, সকল বিরক্তির ওপর দিয়ে শীতল ঝর্ণা-ধারার মত যেন বয়ে যেতইলিচের চিঠিগুলো। তার উজ্জ্বল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা ও কৌতুকগুলো যেন খুশির মুক্তোর মত ঝল্‌মল্ করে উঠতো—আর বিষাদ ও অবসাদের অন্ধকার যেত কেটে।'

আশ্চর্য ব্যাপার—অদ্ভুত ঘটনা—এত বড় বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও, প্রচণ্ড কাজের ও চিন্তার মধ্যে, ডুবে থাকার মধ্যেও তিনি সর্বদা তাঁর মা-য়ের,—স্নেহময়ী ও ইস্পাত-কঠিন মা-য়ের, খোঁজ-খবর নিতেন। প্রতি চিঠিতেই প্রায়, তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিতেন। মা-কে সাহস দিয়ে, উৎসাহ জুগিয়ে জানাতেন যে, তিনি যেন তাঁর এই ইলিচের জন্যে ভাবনা না করেন—তাঁর জন্যে চিন্তা করে শরীর খারাপ না করেন। মা-য়ের সঙ্গে লেনিন অনেকটা বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন—তাঁকে জানাতেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, তাঁর জীবন-ধারার কথা: যেন এক প্রবীণ, জীবনে অনেক পোড় খাওয়া কমরেডের সঙ্গে লেনিন কথা বলেছেন। এ-ছাড়া আরও একটা জিনিষ দেখা গেছে যে লেনিনের আত্মীয়-স্বজন শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ সুহৃদ তাই-ই নয়—তাদের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সহমর্মিতাও তাঁর গড়ে উঠেছিল। সমগ্র পরিবারটি যেন এক বিরাট রাজনৈতিক পার্টির একটা ছোট ইউনিট। কেউ কারুর

থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—কারুর সঙ্গে কারুর মতাদর্শগত কোন বিরোধ বা বিক্ষোভ নেই। এই যোগসূত্র রচনায় লেনিনের সাংগঠনিক প্রতিভারই স্ফুরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

আমরা জেনেছি যে, এই নির্বাসনে বসেই লেনিন রাশিয়ায় মার্কসবাদী পার্টি তৈরীর চূড়ান্ত পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। অবশ্য এখানে আমরা যত সহজে এই কাজের কথা লিখে ফেললাম, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু অত সহজে সেটা করা সম্ভব হয়নি। কারণ,—কারণ তো জানাই; জারের সদা-সতর্ক পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী। নির্বাসনে পাঠিয়েও তাদের শান্তি ছিল না—কি জানি এই নির্জন স্থানে বসে ভ্লাদিমির জারকে উচ্ছেদের জন্যে কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রই না করছে—তাই মাঝে মাঝে তারা লেনিনের নির্বাসন বাসের কুটিরে অতিথি হয়ে সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে যেতো।

তাই গুছোতে স্বামী-স্ত্রীর আবার বেশ কদিন কেটে যেতো। কিন্তু এর মধ্যেও যেমন পার্টি গড়ার পরিকল্পনা তৈরী হলো—তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির মুখপত্র হিসেবে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করবার সব ব্যবস্থাও করে রাখলেন তিনি,—যাতে বেরিয়ে গিয়েই তিনি কাজে লাগতে পারেন। তিনি এই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য—লক্ষ্য এবং আদর্শও রচনা করে ফেললেন।

সংবাদপত্র সম্পর্কে লেনিনের এই পরিকল্পনা কেমন ছিল সে-বিষয়ে ক্রজিজানভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'আমিও ভ্লাদিমিরের সঙ্গে একই জায়গায় নির্বাসিত হয়েছিলাম। যখন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে, সন্ধ্যের সময় দু-জনে ইয়েনিসেই নদীর ধারে বেড়াতাম তখন তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্তব্যের ভার নিয়ে প্রকাশিত হবে যে সংবাদপত্র, তার পরিকল্পনার কথা আমাকে জানাতেন। কি ভাবে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে, কি ভাবে কাগজ বিপ্লবী মার্কসবাদী নীতিতে বিশ্বাসী কমিটি ও গ্রুপগুলিকে একই চিন্তা-সূত্রে বাঁধবে, তার কথা, প্রবল উৎসাহ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাকে জানাতেন।

'তিনি আরও জোর দিয়ে বলতেন যে, শুধু পার্টির প্রচারকার্য চালানোই এর কাজ হবে না—এ পার্টির সংগঠকের ভূমিকাও নেবে এবং সামগ্রিক নীতির বিচারে এই পত্রিকা সমস্ত পুরাতন ধারণাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবে—আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, তার কথা লেনিন অদ্ভুত এক প্রত্যয়-মুগ্ধ কণ্ঠস্বরে আমাকে জানাতেন। আমার শরীরও তাঁর উদ্দীপনার স্পর্শ পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো।'

স্বাভাবিক ভাবেই যাঁর এ রকম প্রচণ্ড কর্মৈষণা, হৃদয়ে এমন বিরাট আকাঙ্ক্ষা, তিনি তো অস্থির হয়ে উঠবেনই। অন্তরে বিপ্লব-যজ্ঞের উষ্ণ লাভা-স্রোত সঞ্চিত হওয়ায় কর্মদীপ্ত লেনিন-আগ্নেয়গিরি যেন কেঁপে উঠেছিলো। তাই নির্বাসনদণ্ড সমাপ্তির শেষ কয়মাস ছিলেন তিনি অত্যন্ত অস্থির, উদ্বেগে নিদারুণভাবে কম্পমান।

এই সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে স্ত্রী ক্রুপ্‌স্কায়া লিখে-ছেন: 'নির্বাসনের শেষ কয় মাস ইলিচ ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর রাতের ঘুম গেল। ভয়ানক রোগা হয়ে গেলেন। না ঘুমিয়ে রাতের পর রাত তিনি শুধু ভাবতেন—আর ভাবতেন, বাইরে গিয়ে কি ভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবেন। তার সমস্ত খুঁটি-নাটি দিকগুলি যাচাই করতেন। সঙ্গে সঙ্গে যতই দিন যায় ততই তিনি অস্থির হয়ে পড়েন—বেরিয়ে গিয়ে কাজ করবার জন্যে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে মাঝে মাঝে পুলিশ এসে খানা-তল্লাসি চালাতো। এতে ইলিচ আরও ঘাবড়ে যেতো—কি জানি আবার কোন ছুতোয় না শয়তানগুলো নির্বাসনদণ্ড বাড়িয়ে দেয়। তা হলেই বোধহয় সব মাটি হবে। যাক, সবই ভালয় ভালয় কাটলো। আর কিছুই হলো না। শেষে একদিন আমাদের নির্বসনদণ্ডের শেষ দিন এসে গেল।'

নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ছাড়া পাওয়ার নির্দেশ এসে গেল। এবং ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী নিজ-ঘরের দিকে যাত্রা করলেন। বিদায় লেনিনের

নির্বাসনের গ্রাম! বিদায় শুশেনকোয়ে!! বিদায় লেনিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র!!! রাতের অন্ধকারের ওপারে বসে আগামীদিনের সূর্য যেমন আরও ঔজ্জ্বল্য, আরও দীপ্তি অর্জন করে ঠিক তেমনি নির্বাসনের নির্জনতায় বসে লেনিন দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশায় জীর্ণ রুশ-দেশের ভাগ্যকে আলোকিত করবার দায়িত্ব নিয়ে নির্বাসন শেষে কর্মক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন।

নির্বাসন স্থান থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হলো। প্রায় ৩২০ কিলোমিটার ঘোড়ায় চড়ে—প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে, তাঁরা দু-জন লেনিন ও ক্রুপস্কায়া সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌তে থাকলেন। আরও জোর—আরও জোরে—সামনে চলো। সক্রিয় বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্যে পিতৃভূমি হাতছানি দিয়ে ডাকছে! চল্, তাড়াতাড়ি চল!! আরো—আরও জোরে!!!

৪.

'আমাদের পথে নেমে আসুক
উজ্জ্বল সুন্দর বসন্ত,
বিষণ্ণ দুর্গত দেশে যেন স্বর্গীয় উপহার,
জীবনের অগ্রদূত যেন, এই লাল বসন্ত।'

লেনিনের কবিতা

মুক্তি! মুক্তি!! মুক্তি!!! সাইবেরিয়ার নির্বাসন জীবন থেকে মুক্তি। কিন্তু ছুটি কই। সামনে যে অনেক কাজের ভীড়—বহু কর্তব্য শেষের দায়িত্ব লেনিনের জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজে—মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী এবং সেই মতাদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অবশ্য এ কাজে সবচেয়ে বড় বাধা শাসক জারের রোষ—তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁর চলা-ফেরার ওপর—অনেক বিধিনিষেধ তাঁর বাসস্থান নির্বাচনের ওপর।

রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তো থাকা চলবেই না। এমন কি

বড় কোন শিল্প-নগরীতেও বাস তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই এক ঢিলে দুই পাখী মারবার উদ্দেশ্যে, সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের কাছেই প্‌স্কভ নামে একটা ছোট্ট শহরে বাসা ঠিক করলেন তিনি। এতে জারের নিষেধ মেনে যেমন রাজধানীতে থাকাও হলো না—তেমনি রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা বা রাখারও কোন অসুবিধে হলো না।

একটা কথা এই সঙ্গে বলে নেওয়া দরকার। লেনিনের নির্বাসন দণ্ড তো শেষ হলো—কিন্তু স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ শেষের তখনও এক বছর বাকী। আগামী কাজের আনন্দের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর এই বিচ্ছিন্ন অবস্থানের দুঃখ তাঁকে মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট দিচ্ছিলো। কিন্তু কি করা যাবে—কর্তব্য যে অনেক বড়।

এই বই-এর পাঠকেরা আগের অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন যে, সাইবেরিয়া থেকে নির্বাসন শেষে লেনিন সস্ত্রীক ঘরের দিকে যাত্রা করেন। হাঁ, কথাটা ঠিকই। তবে স্ত্রী ক্রুপস্কায়াকে বাড়ীতে পৌঁছতে দেওয়া হয় নি। কারণ, তাঁর সাইবেরিয়াতে নির্বাসন শেষ হলেও, মোট দণ্ডের তখনও এক বছর বাকী। সেই বাকী এক বছর তাঁকে কাটাতে হবে উফা গুবের্ণিয়াতে। বিয়ের আগে ক্রুপস্কায়া এখানেই প্রথম নির্বাসিত হয়েছিলেন।

লেনিন প্‌স্কভে আসবার আগে স্ত্রী আব শাশুড়ীকে উফা প্রদেশে পৌঁছে দিয়ে এলেন। তাঁদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন —যাতে বিশেষ কোন অসুবিধে না হয়। এ সবের মধ্যে কিন্তু লেনিন তাঁর আসল কাজ ভোলেন নি—বরঞ্চ তাঁর বিষয়ে এটাই সশ্রদ্ধভাবে লক্ষ্য করার যে, তিনি যেমন নেতা হিসেবে দেশের প্রতি, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মের প্রতি অতি নিষ্ঠাবান ছিলেন; এবং জীবন-মন পরিপূর্ণ ভাবে তাতে উৎসর্গ করেছিলেন; অপরদিকে, সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি স্ত্রী বা সংসারের প্রতিও ছিলেন তেমনই কর্তব্য-সচেতন।

উফা প্রদেশে এই যাওয়া ও অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি সেখানকার সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও মার্কস্‌বাদে অনুরাগী কমরেডদের সঙ্গে

যোগাযোগ করলেন। বর্তমান পরিস্থিতি—আগামী কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনাও করলেন। অর্থাৎ, নির্বাসিতা স্ত্রী—দেশের জন্য সংগ্রামরত ও শাস্তিপ্রাপ্ত কমরেডের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যেমন তাঁর লক্ষ্য—সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ এবং যোগাযোগ ঘটা মাত্রই দেশের অপরাপর মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে নীতি ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে নেওয়াতেও তাঁর ততোধিক আগ্রহ। এই মহনীয়তাই তাঁকে সারা পৃথিবীতে সর্বহারা-প্রজাতন্ত্র স্থষ্টির অবিসংবাদিত নায়ক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পুলিশের খাতায় এক নম্বর বিপ্লবী—জার রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রথম সারির দুষমণ, ভ্লাদিমির ইলিচের পথের সামনে আইনের উঁচু পাঁচিল—ঢুকতে পারেন না মস্কোতে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, ঢুকতে পারেন না কোন বড় শহর—শিল্পনগরী, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রাজধানীতে। কিন্তু তবুও নিষেধের আইনকে অমান্য করেই তিনি মস্কোতে গেলেন তাঁর পরিবারের সকলেব সঙ্গে—মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করলেন।

ঃ 'কেমন আছো সব। আর ভাল থাকবেই বা কি করে, এই অত্যাচার আর শোষণের রাজত্বে। তা-ছাড়া আমাদেব গোটা পরিবারই তো জারের পুলিশের দু-চোখের বিষ। সাবধানে থেকো সব। সবায়ের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগও রেখে চোলো কিন্তু। দুখের দিন শেষ হয় ঐ—কোন ভয় নেই।'

এই সুযোগে মস্কোর কমরেডদের সঙ্গেও তিনি গোপনে দেখা করে ফেললেন। তাঁদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করলেন। নির্বাসনে থাকার সময় প্রচারপত্র, চিঠি, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি সর্বহারার বিপ্লবী মতবাদের যে বীজ বপন করেছিলেন—স্বয়ং এসে তার অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফল যাচাই করে নিলেন। সারা দেশময় ছড়ানো-ছেটানো সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করে বেড়াতে লাগলেন। এইখান থেকে তিনি ঠিক করলেন যে লুকিয়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কমরেডদের সঙ্গেও যোগাযোগ

স্থাপন করে আসতে হবে [মে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ]। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু পথে পুলিশ তাঁকে ধরে ফেললে। যাঃ! সব বুঝি আবার গেল! কিন্তু না, এবারে যে কোন কারণেই হোক তাঁকে খুব তাড়াতাড়িই তারা ছেড়ে দিল।

এইভাবে, গোপনে গোপনে, রিগা, উফা, নিঝ্‌নি, নভগ্‌রোদ, সামারা, স্মোলেনস্ক ইত্যাদি শহরগুলিতে লেনিন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।—উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র—কমিউনিস্ট মতাদর্শকে প্রচার—ব্যাখ্যা এবং সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই সঙ্গে তিনি আরও একটি বড় কাজ করতে চাইলেন—যে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনেক দিনের। তিনি মনে করেন যে কাজ করতে পারলে বিপ্লবের অবস্থা অনেকখানি ত্বরান্বিত হবে। যে কাজ একবার করতে গিয়েও তীরে এসে তরী ডুবেছিল; সে কাজ হচ্ছে, শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব একটা পত্রিকা প্রকাশ করা। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইয়ের সংবাদ প্রকাশ করার জন্যে, সর্বহারার মতবাদকে প্রচার ও আলোচনা করার জন্যে—নিজস্ব একটা পত্রিকা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন।

লেনিন সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে সব কমরেডদের মত পেলেন।—সকলেরই সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন। সংবাদ আদান-প্রদানে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার ভরসা পেলেন। বন্ধুত্ব ও সমমর্মিতার হাত বাড়িয়ে অনেকেই এগিয়ে এলো।

কিন্তু সবচেয়ে ব্যাগড়া দিতে লাগলো জারের পুলিশগুলো। বিপ্লবী কাজকর্ম করা, এমন কি রাশিয়ায় লেনিনের বাস করা পর্যন্ত তারা প্রায় অসম্ভব করে তুললো। পুলিশের বড় কর্তা ওপরের মহলে লিখলেন: 'য়ুলিয়ানভ হচ্ছে এই পালের গোদা। বিপ্লবীদের দলে এর ওপরে কেউ নেই। তাই জারকে যদি বাঁচতে হয়, তবে য়ুলিয়ানভকে সরাতে হবে। এমন কি গুম খুন করেও ফেলা যেতে পারে।'

অতএব সত্যিই যদি বিপ্লবকে বাস্তব মূর্তি দান করতে হয়, তবে

তাঁকে এক্ষুনি দেশ ছাড়তে হবে। যে ভাবনা সেই কাজ। বিভিন্ন স্থানের কমরেডরাও এতে সম্মত হলো। তা-ছাড়া এ-তো আর পলায়ন নয়—বা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে গা-ঢাকা দেওয়া নয়। বাইরে থেকে—রুশদেশের কাছাকাছি দেশগুলোতে, যে সমস্ত সাম্যবাদী ভাবনার কমরেডরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা—এবং রুশদের কর্মপদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা। যদি সত্যিই এবং শীঘ্রই রাশিয়াতে বিপ্লব সংঘটিত করা যায়—বাইরের দেশের জনসাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য ও সৌভ্রাত্র লাভ করা যায়—এই বিদেশ যাত্রার তাও আর এক উদ্দেশ্য।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই অনেক কষ্টে—একান্ত গোপনে, লেনিন রাশিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে দেশের বাইরে গেলেন। ত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম দেশের বাইরে তিনি পা রাখলেন। কাজের উদ্দেশ্যে—বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উপলক্ষে, তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন—কিন্তু দেশের বাইরে, বিদেশের মাটিতে এই প্রথম উপস্থিত হলেন। তাঁর এই প্রবাস জীবন স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ বছর।

তিনি প্রথম এলেন জার্মানিতে। এখানে এসেই তাঁর প্রথম নম্বর কাজ হলো একটা পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করা। যে কোন উপায়েই হোক, যত শীঘ্র হোক, পত্রিকা প্রকাশ করতেই হবে। সর্বহারা শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামেব হাতিয়াব এই পত্রিকার নাম ঠিক হয়েছিল 'ইস্ক্রা' অর্থাৎ 'স্ফুলিঙ্গ'। সার্থক নাম। বিদেশে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যে স্ফুলিঙ্গের সুচনা হয়েছিল, তা অচিরেই প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু এই পত্রিকা প্রকাশ সহজ ছিল না মোটেই। কারণ, প্রথমতঃ জারের পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে। তাই জার্মান-শহর মিউনিকে 'ইস্ক্রা'র সম্পাদক মণ্ডলীর আস্তানা ও প্রকাশ স্থল হলেও তাকে যেতে হতো চেকোশ্লাভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ হয়ে।

লেনিনের চিঠি-পত্তরও এই পথেই যাওয়া-আসা করতো। এ ছাড়াও জার্মান দেশে রুশ ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করবার আর এক অসুবিধে হচ্ছে, রুশী টাইপ [হরফ] জোগাড় করা। একাজ ভীষণ কষ্টসাধ্য। তৃতীয়তঃ, জার্মান সরকারও রুশ বিপ্লবীদের একেবারে মাথায় করে রাখবেন—সে কথা মনে করাও ভুল। সব জায়গাতেই শোষক আর শোষিতের সম্পর্ক এক। এবং সেই শোষণ-মুক্তির জন্যে যারা আন্দোলন করেন, তাদের শাসক-সরকার সব সময়েই যে কেমন নজরে দেখে, তা এ দেশের পাঠককে আর জানাতে হবে না। কারণ, এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বোধ হয় আরও লম্বা ও তেঁতো। তাই মিউনিকেও 'ইস্ক্রা'র প্রকাশের স্থান সম্পর্কে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হলো। সব শেষ যে বাধা, তা-ই হচ্ছে বড় বাধা—তা হলো, টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বাধাই টিঁকলো না। তাই-ই হয়—ইচ্ছা শক্তির দুর্দমনীয় বেগের কাছে সমস্ত প্রতিকূলতার ঐরাবতই খড়-কুটোর মত ভেসে যায়। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে লেনিন এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য খাটতে লাগলেন। এই 'প্রথম সন্তান'টির জন্মের ক্ষণকে সম্ভব এবং ত্বরান্বিত করার জন্য লেনিন আসন্ন-প্রসবা মায়ের মত উত্তেজনায়-আবেগে যেন কাঁপতে লাগলেন। তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ 'আমাদের প্রসবাসন্ন সন্তানটির জন্য সমস্ত জীবন-রস-সুধার উৎসরণ ঘটাতে হবে'।

অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত এলো। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে সাফল্যের, সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো। 'স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাবানল জ্বলবে'—এই বাণী বুকে নিয়ে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ইস্ক্রা' জার্মানীর লিপজিং শহর থেকে প্রকাশিত হলো। প্রথম সংখ্যাটি লিপজিং থেকে প্রকাশিত হলেও, পরবর্তী সংখ্যাগুলি, তারপর মিউনিক থেকেই প্রকাশিত হতে থাকলো।*

*'ইস্ক্রা'র প্রথম সংখ্যাটিতে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখ দেওয়া থাকলেও পত্রিকাটি যে কোন কারণেই হোক, জানুয়ারী ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের আগে ছাপাখানার গর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেনি। —স. মি.

হলোও তাই—ঠিক ঠিক মতই সব ঘটলো। 'ইস্ক্রা'র বুকের স্ফুলিঙ্গ অচিরেই এক বিরাট-বিশাল দাবানল সৃষ্টি করলো। যার প্রচণ্ডতায় রাশিয়ার জারতন্ত্রের স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আগেই বলেছি লেনিন পত্রিকা প্রকাশের বিষয়টাকে কোন মামুলি ঘটনা হিসেবে দেখেন নি। এটাকে পার্টি গঠনের—বিপ্লব সংগঠনের একটা হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাই রাশিয়ায় এই পত্রিকার প্রচারক—বিক্রেতা—সংবাদদাতা এবং এজেন্টদের নিয়ে একটা গ্রুপ—একটা প্রগতিশীল চক্র রচনা করে ফেললেন। তারা পত্রিকাটি সারা রুশ দেশের মধ্যে যতখানি সম্ভব প্রচারিত করতেন, নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠাতেন, নানা খবরাখবর দিয়ে চিঠি পাঠাতেন—পত্রিকা যাতে চলে তার জন্যে চাঁদা তুলতেন এবং সবই পাঠিয়ে দিতেন 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে। পুলিশের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করেও বাবুশকিন, গুসেভ, কালিনিন, স্তাসভা, বাউমান এবং আরও অনেক কমরেড এই কাজ চালাতেন। এঁদের কাজের ওপর লেনিন খুবই গুরুত্ব দিতেন। এবং তাঁদের কাজ দেখে নির্ধারণ করতেন ভবিষ্যতে কাকে কি ভাবে এবং কোন কর্তব্যে নিয়োগ করা যায়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ইতিহাসের খবর নিলেই দেখা যাবে যে, লেনিনের কর্মী নির্বাচনে কোন ভুল বা তাঁদের গড়ে তোলবার কায়দার মধ্যেও কোন ত্রুটি দেখা যায় নি—কারণ ওঁদের মধ্যে অনেকেই আজও রাশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে রয়েছেন। এইভাবে 'ইস্ক্রা' হয়ে উঠলো সমগ্র রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র শক্তি সম্মিলনের, কর্মী বাছায়ের এবং প্রতিপালনের ক্ষেত্র।

এটা তো বুঝতে কারোরই অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে 'ইস্ক্রা' বিদেশ থেকে মোটামুটি নিরাপদে ছাপা হলেও, দেশে পাঠানোর বিষয়টা ছিল অত্যন্ত কঠিন। নানা বুদ্ধি খাটিয়ে এগুলোকে পাঠানো হতো। এবং এই জন্যই এ ছাপা হতো খুব পাতলা অথচ শক্ত

কাগজে। দো-তলা স্যুটকেশের তলায় করে—বই-এর মলাটের ভেতরে ঢুকিয়ে,—রাশিয়ায় যাচ্ছে এমন সব যাত্রী-কমরেডদের ওয়েস্ট কোটের লাইনিঙের ভেতরে সেলাই করে এবং আরো নানা কায়দায় এগুলো পাঠানো হতো। ক্রমেই এই পত্রিকার চাহিদা বেড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মিউনিকের ঐ ছোট্ট প্রেসের পক্ষে আর কপি বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না—তাই ইস্ক্রার কপিগুলি পুনর্মুদ্রণের জন্যে বাকু ও কিশিনেভেও গোপন ছাপাখানা তৈরি করা হলো।

এই পত্রিকাটির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন রুশ তন্তুবায় বলেছিলেন ঃ 'আমার কাছ থেকে অনেক কমরেডই 'ইস্ক্রা' নিতেন—অনেক সময়ে তার বহু সংখ্যাই ছিল একেবারে ছেঁড়া ঝুরি ঝুরি। হলে কি হবে, এর দামের কোন তুলনা নেই—না কোপেকে [রুশী পয়সা] না সময় বা ঘণ্টার মাপে। এর যে কোন সংখ্যার লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে কেন রাশিয়ার পুলিশ, আমাদের শ্রমিক কমরেড ও নেতাদের ভয় করে। এ পত্রিকা চলতো আমাদের প্রয়োজনে, গোটা রাশিয়ার স্বার্থে।'

এই পত্রিকার লেখাকে অবলম্বন করে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে—তার কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। সেটা হলো তাঁর 'লেনিন' এই ছদ্ম নাম গ্রহণ। কারণ, এই সময় থেকেই [১৯০১ সালের শেষের দিকে] ভ্লাদিমির তাঁর কোন কোন রচনার নিচে 'লেনিন' এই ছদ্মনাম ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়া বলেছেন যে এই ছদ্মনাম গ্রহণ নেহাতই আকস্মিক ব্যাপার—এর সঙ্গে কোন কিছুরই যোগাযোগ নেই। আবার কেউ কেউ অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন যে জার্মানীতে তাঁর সহযোগী কমরেড প্লেখানভ মহান ভলগা নদীর নাম অনুসরণ করে 'ইস্ক্রা'তে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির নিচে 'ভলগিন' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তারই অনুসরণ করে ভ্লাদিমির রুশীয়-সাইবেরিয়ার মহান নদী লেনা-র নামানুসারে 'লেনিন' ছদ্মনামটি পছন্দ করেছিলেন।

যাই হোক, এখান থেকেই তিনি লেনিন নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন—পরে যে নাম বিশ্বের সর্বত্র একটি মন্ত্রের মত ছড়িয়ে পড়ে।—মহামুক্তির বীজমন্ত্র।

এই সময়ে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লেনিনের বিখ্যাত বইটি—'কি করতে হবে?' [*What is to be Done?*] প্রকাশিত হয়। বেশ কিছুকাল ধরে, দেশে থেকে এবং বিদেশে গিয়ে তিনি যে সর্বহারার পার্টিগঠনের ভূমিকা করে আসছিলেন—এ বইতে তার বিশদ্ পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই পার্টিকে হতে হবে আগাগোড়া বিপ্লবী—নতুন ধরণের এক সংগ্রামী পার্টি। 'কি করতে হবে' বইটি রাশিয়ার আগামীদিনের বিপ্লব পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং রুশ দেশের বিপ্লবী কর্মীদের মতবাদ বিচারে ও নির্ধারণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাই বইটির সম্বন্ধে এখানে দু-চার কথা বলা একান্তই প্রয়োজন। বইটির তত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদির কঠিন বিষয়ের খোলাটাকে ফেলে দিয়ে, আমি এখানে যথাসাধ্য সরলভাবে মূল বক্তব্যের শাঁসটাকে উপস্থিত করবো। লেনিনের জীবনী—রুশ বিপ্লবের গোড়ার কথা জানতে হলে, এই বইটির বিষয় কিছু নিরস হলেও, পাঠককে জানতেই হবে: কাঁটা আছে বলে গোলাপ সংগ্রহ করবো না, তা তো হতে পারে না।

রাশিয়ার সর্বহারার পার্টি তৈরী হবার অনেক আগে থেকেই পশ্চিম য়ুরোপ অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ছিল। কিন্তু দু-এর মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক। কেন না, পশ্চিম য়ুরোপের ঐ সমস্ত শ্রমিক পার্টিগুলি সাধারণত আপোষমূলক সুবিধাবাদের পক্ষে কাজ করতো। তারা বলতো, তোমরা তোমাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নাও—আর আমাদের দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পরতে দাও—ব্যাস্ তাতেই হবে। কি হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করে, সর্বহারার একনায়কত্ব রচনা করে। এতে করে ঐ সমস্ত দেশের শ্রমিকরা আস্তে আস্তে আপোষকামী, বড়লোক

বুর্জোয়া মালিকদের অনুগৃহীতের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এবং তাদের পার্টিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে পড়ছিলো। তা-ছাড়া তারা সুবিধাবাদের যে নিন্দা করত, তা কেবল কথায়—আসলে তাদের কাজ হয়ে পড়েছিল, পুঁজিবাদের ও সুবিধাবাদের সঙ্গ সমঝওতা করে চলা।

কিন্তু লেনিন তাঁর বইতে, ওপরের ঐ শ্রমিক পার্টির ত্রুটি দেখিয়ে রুশ পার্টি গড়ার প্রসঙ্গে বললেন যে, জারের স্বৈরাচার ও পুঁজিবাদকে গুড়িয়ে দিতে হলে খাঁটি বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গড়ে তুলতে হবে ;—সশস্ত্র হয়ে বৈপ্লবিক তত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হলো, 'বিপ্লবীতত্ত্ব ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন আদৌ সম্ভব নয়।'

লেনিন দেখালেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাঝামাঝি বলে কিছু নেই—হয় ধনিক ব্যবস্থার সেবা, নয় সর্বহারার মতাদর্শ। আর, এটা তো সবাই জানে যে বুর্জোয়াদের প্রচার ব্যবস্থার ক্ষমতা ও সুযোগ অনেক বেশি। তাই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রধান এবং প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে যে শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে রাজনৈতিকীকরণ [politicalization] করা। এই কারণেই সর্বশক্তিমান এবং কেন্দ্রীয় শক্তির অধিকারী, দৃঢ়বদ্ধ একটি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি তৈরীর পরিকল্পনা, এই বই-এর মধ্যে দিয়ে লেনিন গড়ে তোলেন।

তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, দু-দিক থেকে পার্টি গড়ে তুলতে হবে : প্রথমত, যারা স্থায়ী ভাবে ও সক্রিয় হয়ে সব সময়ের জন্যে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে পরিগণিত হবে ; এবং দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি স্থানীয় সংগঠনের মধ্যে থেকে ব্যাপক ও সাধারণ পার্টি সভ্য।

প্রথম ধরণের বিপ্লবী কর্মী-সঙ্ঘ গড়ে তোলার ওপর লেনিন বিশেষ জোর দেন ; কারণ, তিনি মনে করেন যে এরাই থাকবে দেশের জনগণের একেবারে কাছাকাছি—তাদের মনের স্পর্শ ও চেতনার একেবারে গভীরে। সাধারণ মানুষের ওপর যেখানেই পীড়ন,

অত্যাচার ঘটবে তারা তার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ রুখে দাঁড়াবে, 'প্রত্যেকটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারকেও নিজের বিপ্লবী আদর্শের পক্ষে ব্যবহার করে, সকলের সামনে হাজির করাই হবে, সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।'

এই প্রসঙ্গে লেনিন আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ চালালেন। এই সব দিক থেকে বিচারের ফল হিসেবে, এই গ্রন্থটির প্রকাশ শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে—অর্থাৎ নতুন লক্ষ্যের পার্টি গড়া ও তার কর্মনির্দেশ যেখানে চূড়ান্ত রূপে ঠিক হবে সেই সম্মেলনের সূচনায়, এক বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য বয়ে নিয়ে আসে। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণের এই সমস্ত ঘটনাই সমগ্র রুশ দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে এক নতুন পথে চালিত করে। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

শুধু বই লিখেই খালাস হলেন না তিনি।—এই বই-এর ফলাফল কি হলো, বা কি হচ্ছে সে বিষয়েও তিনি খোঁজ নিতে লাগলেন। তিনি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে জার্মানী থেকে মস্কোর শ্রমিক পার্টিকে লেখা এক চিঠিতে জানতে চাইলেন, 'কি করতে হবে?' বইটা আপনার সকলেই পেয়েছেন তো? শ্রমিকেরা সকলেই কি সেটা পড়েছে? তাদের মত কি? এখানেই লেনিনের মতবাদ ও নায়কত্বের সার্থকতা—কেন না, তিনি শুধু চিন্তা করেই বা মত তৈরী করেই দায়িত্ব শেষ করতেন না—তা কতখানি কার্যকরী হচ্ছে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতেন।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের সুরু থেকেই পুলিশ ও গোয়েন্দারা 'ইস্ক্রা' এবং তার সম্পাদকমণ্ডলীর এবং তাদের প্রধান লেনিনের সংবাদ পেয়ে যায়। সবাইকে একসঙ্গে ছেঁকে তুলে নেবার জন্যে ধীরে ধীরে জাল পাতা হতে থাকে। লেনিন ও তাঁর সঙ্গীরাও খবর পেয়ে যান যথাসময়েঃ আর এখানে নয়, মিউনিক থেকে পাততাড়ি গোটাও। কোথায় যাওয়া যায়। শেষে ঠিক হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডনে চলো। জায়গা-পত্তর ঠিক করে পত্রিকার প্রকাশনা কেন্দ্র

মিউনিক থেকে লণ্ডনে স্থানান্তরিত হলো। লেনিনও ঐ বছরের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে চলে এলেন।

লণ্ডন! লণ্ডন!! লণ্ডন!!! বৃটিশ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্ঞী। যে সাম্রাজ্য থেকে কখনও সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্য-কিরীটের কোহিনূর। এই সেই লণ্ডন, যেখানে লেনিনের মানস-গুরু মহামনীষী কার্ল মার্কস সাধনা করে গেছেন।

সেই লণ্ডনে এসেই তিনি নতুন উদ্যমে কাজকর্ম সুরু করলেন। এছাড়াও তিনি এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। কাগজের সংবাদ থেকে জেনে নিতেন তিনি, কখন কোথায় শ্রমিকদের মিটিং হচ্ছে, তখনই সেখানে গিয়ে হাজির হতেন—এবং একধারে চুপ করে বসে থেকে ওখানকাব শ্রমিকদের বক্তব্য, মতামত ও কর্মপদ্ধতি শুনে তা বুঝবাব চেষ্টা করতেন।

লণ্ডনে এসে আব একটা কাজ তাঁর প্রায় নৈমত্তিক ছিল—তা হচ্ছে বৃটিশ মিউজিযমের লাইব্রেরীতে যাওয়া এবং বই পড়া। একলব্যের মত মন্ত্রগুরুর সাধন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বোধহয় তাঁর অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করতেন তিনি। যে স্বপ্নের ছবির রূপরেখা মহামতি মার্কস এঁকে গেছেন, তাকেই বাস্তব মূর্তি দেবার জন্যে বোধহয় মহামানব লেনিন এই গ্রন্থাগারে উপস্থিত হতেন;—শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করতেন।

প্রায় এক বছরের মত সময় লেনিন লণ্ডনে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যেমন বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে যাতায়াত করতেন, শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন—তেমনিই ঠিক করলেন, যে তাঁর ইংরেজি জ্ঞানও কিছুটা বাড়িয়ে নেবেন। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, তাঁকে আর ক্রুপস্কায়াকে ইংরেজি শেখানোর বিনিময়ে রাশিয়ান শিখতে চাওয়ার লোক ঠিক করলেন।

ঐ বছরের জুন মাসের শেষের দিকে লেনিন তাঁব মা আর বড়

বোনের সঙ্গে দেখা করলেন। সে সময়ে তাঁরা ফরাসী দেশের উত্তর-সমুদ্র তীরের একটা ছোট্ট শহরে বাস করছিলেন। মা-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই সময়ে লেনিনের কিছুটা বিশ্রামও জুটে গেল। সংগঠন তৈরী, পত্রিকা প্রকাশ, পড়াশুনা-লেখা ইত্যাদি কাজের প্রচণ্ড চাপে—অবকাশ তো আর জোটে না; তাই মায়ের স্নেহ-স্পর্শচ্ছায়ায় এসে ক-টা সপ্তাহ তাঁর বেশ খুশিতেই কেটে গেল।

এই সময়ে যখন তিনি মায়ের কাছে এসে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম করছিলেন, দু-টো ঘটনা, একদিকে যেমন লেনিনের জীবনে, অপরদিকে তেমনি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে নিয়ে আসে।

প্রথমটি ঘটে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। প্যারিসে 'রুশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের উচ্চ বিদ্যালয়' ['Russian Higher School of Social Sciences'] নামে প্রবাসী রুশদের একটি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে 'য়ুরোপ এবং রাশিয়ার ভূ-সম্পত্তির সম-বণ্টন প্রশ্নে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী' [*Marxist Views on the Agrarian Question in Europe and in Russia*] বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দেবার জন্যে সুপরিচিত মার্কস্‌বাদী ভি. ইলিন'কে আমন্ত্রণ জানানো হয়! খুব স্বাভাবিক যে, সোজা পথে এই নিমন্ত্রণ আসে নি। কারণ, ঐ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই বিপ্লবী সাম্যবাদকে বিবপ নজরে দেখতো। কিন্তু তবুও বেশ কিছু সংখ্যক সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ছাত্রের চাপে পড়ে এবং লেনিনের মার্কসীয় তত্ত্ব-জ্ঞান বিষয়ে খ্যাতির কারণে শেষ পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ তাঁকে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিতে রাজী হলো। কিন্তু মজা হলো, বক্তৃতা দেবার সময় তাঁকে বক্তা হিসেবে মঞ্চে দেখে। আরে, এ তো সেই ভয়ঙ্কর লোকটা—লেনিন ছদ্মনামে যে বিখ্যাত।—কি সর্বনাশ, একে তো কোনক্রমেই বক্তৃতা দিতে দেওয়া যায় না। ভাগো—ভাগো সব। না মশাই, আপনাকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে না, কেটে পড়ুন। আপনি নামের জোচ্চুরি করে নেমতন্নটা পেয়ে গেছেন।

কিন্তু ছেলেরা শুনবে কেন ? তারা একেবারে হৈ হৈ, রৈ রৈ করে উঠলো। ও সব চলবে না। ভদ্রলোককে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়ে গেছে, এবং উনিও যখন বলবার জন্যে প্রস্তুত, তখন আমরা ওঁর বক্তৃতা শুনবোই। এতে যা হয় হবে—আপনারা, জারের দালালেরা, যা পারেন তা করবেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের দাবীর কাছে হার স্বীকার করতেই হলো। লেনিন ছাত্রদের সামনে তাঁর বক্তৃতা সম্পন্ন করলেন। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐ ঘটনাকে তাদের জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় বলে মনে করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে আসার আগে, ১৮ই মার্চ, ১৯০৩। হোয়াইট চ্যাপেলের সামনে একটা বিরাট শ্রমিক সমাবেশের সামনে লেনিনের বক্তৃতা দান। প্যারি কমিউনের বাৎসরিক জয়ন্তী উপলক্ষে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বিদেশে, অ-রুশ জনতার সামনে, লেনিনের জীবনে এই প্রথম ভাষণ। তেত্রিশ বছরের যুবক, বিরাট সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে, শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তব্য সম্বন্ধে, প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে সেদিন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা একদিকে যেমন সমগ্র শ্রোতাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলো—তেমনি লেনিনের আত্মবিশ্বাসকেও ঋজু ও দৃঢ়মূল করেছিল। লেনিনের জীবনে, প্যারিসের এই দু-টি ঘটনাই খুবই স্মরণীয়।

এখান থেকে তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে গেলেন।

কিন্তু আর বেশিদিন লণ্ডনে থাকা চললো না। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে লেনিন সস্ত্রীক লণ্ডন পরিত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জেনিভায় চলে এলেন। 'ইস্ক্রা'র মুদ্রণ ব্যবস্থাও চলে এলো জেনিভাতে। লেনিন নিজেও জেনিভা শহরের উপকণ্ঠে সপরিবারে একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া করে বসবাস করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এই বাসা রাজনৈতিক আসামীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলো। রাশিয়া থেকে শাস্তি পাওয়া, নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসা কমিউনিস্ট কর্মীরা প্রথমেই আশ্রয় এবং আশ্বাসের আশায়

লেনিনের কাছে চলে আসতো। স্বাভাবিক ভাবেই—নিঃস্ব, পলাতক দেশের জন্যে সর্বত্যাগী এবং পারিবারিক জীবনে ছন্নছাড়া এই সমস্ত লোকদের জন্যে—তাদের আহার, বাসস্থান এবং একটা কিছু করে দেবার জন্যে লেনিন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এবং কিছু একটা না করে দেওয়া পর্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন।

নেতা হিসেবে—তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে, এই ভাবে তাদের গ্রহণ কবার মধ্যে দিয়ে, লেনিনের জীবনের আর একদিকের পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্য শুধু মাত্র প্রচণ্ড তাপ বিকিরণই করে না—ধরণী-মৃত্তিকার অন্তরে আগামী জীবনের সম্ভাবনাকেও পবিপুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। এই সমস্ত ঘরছাড়া দেশপ্রেমিকদের কষ্ট—অনাহার—অনিদ্রাক্লিষ্ট চেহারা দেখে মহানায়ক লেনিনেব সংবেদনশীল মন চঞ্চল হয়ে উঠতো;—হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও সহানুভূতি দিয়ে এবং নিষ্ঠাবান গৃহীর মত তাদের ব্যথা-বেদনাকে ধুয়ে-মুছে দেবার চেষ্টা করতেন তিনি। আহার-বাসস্থান বা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে, আগামী কঠিন কর্তব্যের জন্যে তাদের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে চাঙ্গা করে তুলতেন।

এখানে যাঁরাই তাঁর কাছে আসতো তাঁদেরই মনে হতো যে, ইনি শুধু একজন কঠিন বিপ্লবপন্থী নেতা ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতাই নন; ইনি বন্ধুর মত প্রিয়, বড় ভাই-এর মত আন্তরিক, অগ্রজ কমরেডের মত কর্তব্যনিষ্ঠ; অন্যদিকে আবার হাসি-ঠাট্টায়, মধুব প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, আলাপ-আলোচনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ঘরোয়া আমেজ ও পরিবেশ গড়ে তুলতেন। তাদের মনে হয়েছে, এ কেবল সর্বহারার মুক্তি সাধনের জন্যে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর দাবানলই নয়—এ গৃহকোণের প্রীতি-মধুর নিষ্কম্প প্রদীপের শিখাও;—যে নিজে জ্বলে অপরকে আলোদান করে।

সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসার মাস দুই আগে লেনিন 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' [*To the Rural Poor*] নামে আরও একটি পুস্তিকা

রচনা করেন। শুধু শ্রমিকদের মধ্যেই নয়, গ্রামের শোষিত এবং দরিদ্রতম কৃষকদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা ছড়ানোর প্রয়োজন ; তাদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়ার সঙ্গে শহর-শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের আন্দোলনকে এক করে দিতে হবে। কেউ কারুব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—বন্দুকধারী সৈনিকের দু-টো হাতেরই মত ঃ শ্রমিক আর কৃষক। খুব সহজ ভাষায় এবং সরল উপমার দ্বারা তিনি গ্রামের কৃষকদের বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি কি চাইছেন—তাঁর দল কি করতে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ কি ? সমাজতন্ত্র কাকে বলে ? এতে গ্রামের গরীব কৃষকদের কর্তব্য কি ? —লাভ কোথায় ?

এইভাবে একের পব এক প্রবন্ধ লিখে শহবের সঙ্গে গ্রামেব—গ্রামের সঙ্গে গঞ্জের—সব জাযগাব, সমস্ত সর্বহারা শ্রেণীকে একই স্বার্থে ও কর্তব্য কর্মে বাঁধতে লাগলেন তিনি। সকলকে একই লক্ষ্যের পথে—শোষণ মুক্তির পাবে, এনে হাজির করতে চাইলেন।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে 'কি কবতে হবে ?' বইটা প্রকাশেব প্রায় সময় সময়ই 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে এক মত বিরোধ আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য এসব মতবিবোধ কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রযোজনকে অবলম্বন কবে দেখা দেয় নি। মত-পার্থক্য শুরু হয় প্রধানত রাশিযার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষেণ, শ্রেণী-দ্বন্দ্বব স্বরূপ নির্ণযে এবং বিপ্লব-সূচনার পদ্ধতি নিয়ে। তিনি এই পত্রিকাব মধ্যে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে নিববচ্ছিন্ন ভাবে আক্রমণ চালিযে ছিলেন। এ ছাডাও পার্টিব কর্মসূচী তৈরি নিয়েও তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। এইভাবে যখন একটা মতানৈক্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি হযে রযেছে, ঠিক সেই সময়েই তাঁর 'কি করতে হবে ?' বইটি প্রকাশিত হলো [১৯০২, মে]। আর আমরা, 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধ ; 'কি করতে হবে' এবং 'গ্রামের গরীবদের প্রতি' বই-এর প্রকাশ ; লেনিনের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জেনিভা বাসের সঙ্গে সঙ্গে 'ইস্ক্রা'র প্রকাশস্থান পরিবর্তিত হয়ে—ঘুরে, আসার মধ্যে দিয়ে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

শ্রমিক পার্টি'র' দ্বিতীয় কংগ্রেস-এর উদ্বোধন-দ্বারে এসে পৌঁছলাম। এতদিন যে মতবিরোধ লেখার মধ্যে দিয়ে—ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে দিয়ে কিছুটা অপ্রকাশ্যে চলে আসছিল; দ্বিতীয় কংগ্রেসে সেই মতবিরোধ কিন্তু চূড়ান্ত ভাঙ্গনের রূপ নিল। এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত মার্কসীয় তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণে রুশীয় পার্টি এবং লেনিন-ই অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন,—তাই রুশীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র ভাঙ্গন সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনকে এক নতুন দিক পরিবর্তনের মুখে এনে হাজির করলো। মস্তিষ্কের যন্ত্রণা সারা দেহেই ছাড়িয়ে পড়লো।

প্রায় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে যে মত-বিতর্ক চলছিল তাকে পার্টি কমরেডদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যেই যাচাই—বিচার—ও বাছাই করে নেবার জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটি কংগ্রেস* ডাকার প্রয়োজন হয়। এতে যেমন সকলেই তাদের বক্তব্য খোলাখুলি রাখতে পারবে—তেমনিই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীতেও পৌঁছানো যাবে।

লেনিন মনপ্রাণ দিয়ে প্রস্তুতি গড়ে তুললেন দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্যে, অধীর আগ্রহে। এর ভবিষ্যৎ সাফল্যে উত্তেজনায় যেন মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠতেন তিনি। যাঁরা এই কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে প্রতিনিধি হিসেবে আসতে থাকলেন তাঁদের সঙ্গে বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে তিনি মেলামেশা ও আলোচনা করতে থাকেন।

অবশেষে সব উত্তেজনার শেষ হলো। এলো ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস। বেলজিয়াম রাষ্ট্রের ব্রাসেলস্ শহরে দ্বিতীয় কংগ্রেসের

* কিছুদিন পরে পরে নিম্নপর্যায় থেকে বিশেষভাবে আলোচনা হয়ে এসে এবং সম্যক্ প্রস্তুতির পরে যে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসে তাকেই কংগ্রেস বলে। কমিউনিস্ট মতাবলম্বীদের এই কংগ্রেস তাদের কর্মপদ্ধতির দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে গৃহীত মূল সিদ্ধান্তগুলি আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি নিধারণের জন্যেই গৃহীত হয়ে থাকে এবং পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত পার্টির পক্ষে সেই সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক ভাবেই মেনে চলতে হয়। —স. মি.

অধিবেশন সুরু হলো। গোপনীয়তার জন্যে ময়দার একটা গুদাম ঘরে এর অধিবেশন বসলো। ময়দা গুদামের জানলাগুলি লাল পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। অস্থায়ীভাবে তৈরী একট মঞ্চ থেকে প্লেখানভ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের গর্বিত অনুভূতি প্রতিটি প্রতিনিধি কমরেডের অন্তর পরিপূর্ণ করে তুলেছিল।

প্রথম কংগ্রেসে প্রতিনিধি এসেছিল মাত্র ন-জন। সেখানে এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে ছাব্বিশটি পার্টি-সংগঠনের পক্ষ থেকে তেতাল্লিশ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। এই অধিবেশনের [কংগ্রেসের] আলোচ্য বিষয়সূচী ছিল মোট কুড়িটি। তাব মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো : এক. পার্টির কর্ম-পরিকল্পনা ; দুই. পার্টির নিয়মাবলী ; তিন. কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন ; এবং চার. কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর নির্বাচন। এর মধ্যে এক ও দুই নম্বর বিষয় নিয়ে অধিবেশনে তুমুল বিতর্ক এবং সুদীর্ঘ আলোচনা চলে।

এই অধিবেশনে পার্টির কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা এবং তার ফল বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সর্বহারার বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছিল ; তাই এখানে তার বিষয়ে কিছু আলোচনা করার দরকার বলে মনে করি। তা না হলে লেনিনের জীবন-কথার পরিচয় গ্রহণ আদৌ সম্পূর্ণতা লাভ করবে না। সর্বহারার বিপ্লব অনুষ্ঠান ও বিশ্বে প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রুশ দেশ যে গৌরব অর্জন করেছে তার পটভূমিকা এবং তাতে লেনিনের নেতৃত্বদানের ঘটনা এই অধিবেশনের নীট ফল।

আগেই জানিয়েছি যে, দ্বিতীয় কংগ্রেসের উত্থাপিত পার্টি প্রোগ্রামের খসড়া তৈরীর কাজে এবং নিয়মাবলী রচনায় লেনিন দীর্ঘ সময় দিয়েছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর মার্কসবাদের শিক্ষা এক চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তিনি এই খসড়া দলিলে বলতে চাইলেন যে, রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত নতুন নতুন পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে,

তার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিকে মার্কসীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে দাঁড়াতেই হবে। এবং সবশেষে তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নতুন লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হবে। তা-না হলে পার্টি জনগণের সচেতনতা, বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না—পেছিয়ে পড়বে। ট্রেনের বগিগুলি যাবে এগিয়ে—ইঞ্জিন থাকবে দাঁড়িয়ে। এবং তার ফলে অতি কষ্টে গড়ে তোলা পার্টি ইউনিটগুলি এবং তার বৈপ্লবিক সেলগুলি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সম্পন্ন পার্টির অভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

লেনিন ঐ খসড়ায় আরো বললেন যে পার্টিকে বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করতেই হবে—এবং যার আসল কথা হবে সর্বহারার এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। এ-কাজে শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকা থাকলেও কৃষক সমাজকে তার পাশে টেনে নিতেই হবে। পৃথিবীর শোষিত এবং সর্বহারার কোন দেশ-জাত সম্প্রদায় নেই—তাই তাদের সবাইকেই এক সর্বহারার আন্তর্জাতিকতায় বাঁধতেই হবে।

অধিবেশনেব দ্বিতীয় বিষয় পার্টির নিয়মাবলীর আলোচনাতেও প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। লেনিন বললেন যে, এতে নিশ্চয়ই কোন কমরেডের দ্বিমত নেই যে আমাদের দল পরিণত হোক বিপ্লবাত্মক সংগ্রামে বিশ্বাসী একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টিতে। তাই আমাদের এই পার্টিতে চাই কঠোর শৃঙ্খলা। প্রত্যেকটি পার্টি-সভ্যকে কঠোর ভাবে সেই শৃঙ্খলা মেনে চলতেই হবে। পার্টির কর্মসূচীও নিষ্ঠার সঙ্গে এবং দ্বিধাহীনভাবে মেনে চলবে সে। নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে। পার্টির সমস্ত সদস্যকে কাজ করতে হবে। এবং প্রত্যেক সদস্যকে কোন না কোন একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। সর্বোপরি, তাকে কাজ এবং সংহতিতে উচ্চ মান ও মানসিকতার পরিচয় দিতে-ই হবে।

প্রধানত এই দুই প্রশ্নে সমগ্র কংগ্রেস পরিষ্কার ভাবে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু লেনিন তাঁর মত এবং বক্তব্যে দৃঢ় ও অবিচল থাকেন। তিনি পার্টিকে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা থেকে যেমন

একচুল সরিয়ে আনতে রাজী হন না, তেমনি দুর্বল, *দোলাচলচিত্ত,* এবং কঠিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নয় এই রকম লোককে পার্টি সদস্য করতে তিনি কোন মতেই রাজী নন। লেনিনের মতাদর্শ গত এই সংগ্রাম যে কত সতেজ ও জোরালো ছিল তা দ্বিতীয় কংগ্রেসের কার্য-বিবরণীর অনুলিপি [*Minutes of the 2nd Congress*]-তে তাঁর একশ-রও বেশী বক্তৃতা এবং মন্তব্যগুলি দেখলেই বোঝা যাবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লেনিনেরই জয় হলো। সুবিধাবাদীরা কোণঠাসা হয়ে পড়লো—যুক্তির ক্ষেত্রে তারা অসহায় হয়ে পড়লো এবং সব শেষে তাদের মধ্যের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসের সভা ছেড়ে চলে গেল। কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনের কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচন-কালে দেখা যায় যে শক্তির ভারসাম্য লেনিনের মতেব দিক ঝুঁকে পড়েছে। বেশী সংখ্যক ভোট পেয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিরঝিঝানো ভস্‌কি, লেন্‌গকি. নোস্‌কোভ এবং পার্টি মুখপত্র 'ইস্ক্রা'র সম্পাদক-মণ্ডলীতে লেনিন, প্লেখানভ, মার্তভ জয়লাভ করেছেন। যেহেতু লেনিনের সমর্থকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান তাই তাঁরা এর পর থেকে পরিচিত হতে থাকেন **বলশেভিক** [রুশ ভাষায় 'বলশিনস্তভো অর্থাৎ ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ] নামে এবং যাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পান তাঁরা পরিচিত হন **মেনশেভিক** [রুশ ভাষায় 'মেন-শিনস্তভো', অর্থাৎ ঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ] নামে।

'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র এই দ্বিতীয় কংগ্রেসের মোট ফল দেশ এবং বিদেশের, এক কথায় পৃথিবীর খেটে-খাওয়া মানুষের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যবাহী দিকচিহ্ন নির্দেশ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে লেনিনের মতাদর্শের বিজয়, রুশীয় বিপ্লবীদের সর্বহারার পার্টি গঠনে, লেনিনের মহান লড়াইয়েরই ফল। এই পার্টি দ্বিতীয় কংগ্রেসের সংশোধনবাদীদের পার্টি থেকে মূলগত ভাবে আলাদা।

এই সঙ্গে একটা কথা আমার বলতে ভুলে গেছি, তা হচ্ছে যে ব্রাসেল্‌সে এই কংগ্রেস শুরু হওয়ার কিছু পরেই বেলজিয়ান পুলিশ

ভীষণ ভাবে এর পেছনে লাগে। শেষে এমন হয় যে অধিবেশন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন বাধ্য হয়েই অধিবেশনকে লণ্ডনে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

লণ্ডনে পার্টি কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলে লেনিন তাঁর কিছু সঙ্গীকে নিয়ে একদিন হাইগেট সমাধিস্থানে মহামনীষী কার্ল মার্কসের সমাধি-স্থান দেখে আসেন। উদ্দেশ্য কি শুধুই শ্রদ্ধা নিবেদন—শুধুই সৌজন্য প্রদর্শন। হয়তো তাই! অথবাঃ মোটামুটি ভাবে মার্কসের তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন ও তার জন্যে লড়াই করছেন তার জয়ের সংবাদ ঐ সমাধিস্থানে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটাকে জানিয়ে আসা—নতুনতর পথে চলবার জন্যে শক্তি প্রার্থনা করা!

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকেই আভ্যন্তরীণ-মত-দ্বন্দ্ব অত্যন্ত জটিল ও তীব্ররূপ ধারণ করে। এই মত-কলহ দীর্ঘ দিন ধরে রুশীয় রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করেছে। যারা নিজেদের সব সময় বিপ্লবী বলে প্রচার করতো—'বামপন্থী' গরম গরম বুলি ও বক্তৃতায় আসর মাত করে রাখতো, তারাই কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় প্রায় মৃত 'অর্থনীতিবাদীদের' জায়গা দখল করে তাদের সুবিধাবাদী কাজকর্ম চালিয়ে যেতো। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি—যারা বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাদের প্রতি এই কাজ চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি? লেনিন মার্কসবাদের নীতি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে অবিচল ভাবে লড়াই করে যেতে লাগলেন। তিনি সব্যসাচীর মত এক হাতে যেমন মালিক, ধনিক, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াচক্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন—তেমনি সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার অন্য নাম সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেছেন—তীব্র ভাষায় এবং ক্ষমাহীন ভাবে তাদের নিন্দা করেছেন।

এই পটভূমিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'এক কদম আগে, দুই কদম পিছে' [*One step Forword, Two steps back*] —১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। এখানে লেনিন বোঝালেন যে

পার্টিকে সব সময় হাজার হাজার খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে—শ্রমিক ও পার্টির মধ্যে সমঝওতা পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধন দৃঢ় না হলে পার্টি কখনও বাড়তে বা, বাঁচতে পারে না। সমগ্র পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থটি, সমস্ত পার্টি সংগঠনের কাছেই অনুমোদন লাভ করে। শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এর প্রচার ঘটে।

এই ভাবে সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনের পক্ষেই মূল্যবান ও শিক্ষণীয় দলিল হয়ে রইলো। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে—একথা স্বীকৃত হয়ে গেলো। এবং এইখান থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব, আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে লেনিনের পদ্ধতিই নির্ভুল এবং একমাত্র। তিনিই যথার্থভাবে এবং অনন্যরূপে মার্কসবাদ-এঙ্গেলসবাদের উত্তরপুরুষ। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঋষি-দর্শনের মূল্য লাভ করেছে। এবং আজকের ইতিহাসেব প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না যে সেদিন লেনিন কত অভ্রান্ত ছিলেন—বিপ্লব পরিচালনার কর্ণধার হিসেবে তিনি কত যোগ্য ছিলেন। কত মহান ছিলো তাঁর নেতৃত্ব।

এক বছর না যেতে যেতেই লেনিন এবং তাঁর নির্দেশে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বলশেভিক অংশ পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশেন অনুষ্ঠিত করার জন্যে জোর আন্দোলন চালাতে লাগলেন। রাশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিতে এটা তখন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এছাড়া পার্টির মেনশেভিকরা পার্টির ভাঙ্গনের কাজে বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছিলো—তারা পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচী ও নিয়মাবলী যেমন খুশি ভেঙ্গে চলতো। সর্বতোভাবে পার্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করতো। এই জন্যেই লেনিন স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ এই ধ্বংসকে প্রতিরোধ করতে চাইলেন—তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্যে সকলকে বোঝাতে

লাগলেন। লেনিনের আহ্বানের সঙ্গে রাশিয়ার পার্টিগুলির অধিকাংশ কমিটি কণ্ঠ মেলালেন। পার্টির মূল সদস্যরা লেনিনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে লেনিনকে তাঁদের নায়ক বলে মেনে নিলেন। ঠিক এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার জনগণ এবং পার্টি ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের অগ্নিক্ষরা আবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করলো। পার্টি, সর্বহারা শ্রেণী, শ্রমিক-কৃষক সকলকেই এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সামনে হাজির হতে হলো।

৫.

'১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের 'প্রাথমিক মহড়া ব্যতীত
১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লব আদৌ
সম্ভব হতো না।'

লেনিন

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ। রুশদেশের বিপ্লবের আকাশের ভোরের পাখী। আবার পৃথিবীর শোষণের আর অত্যাচারের জগতে রক্তাক্ত বছর। এই বছরেরই ৯ই জানুয়ারী একদিকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের 'শীত প্রাসাদের' সামনে জারের গুলিতে এক হাজারেরও বেশী শ্রমিক আর তাদের স্ত্রী, শিশুপুত্র, বৃদ্ধ পিতা প্রাণ দিয়ে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের তীরে পৌঁছে গেল ঃ আর অন্যদিকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জালিয়ানাবাগের ঘেরা পার্কে ৩৭৯ জন নারী-পুরুষ পিশাচ ইংরাজ সেনানায়ক ডায়ারের গুলিতে প্রাণ দিয়ে খণ্ডবিচ্ছিন্ন ভারতমাতার ভিক্ষুক সন্তানে পরিণত হলো। কি হাস্যকর বৈপরীত্য!

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যন্ত্রপাতি তৈরীর একটা মস্তবড় কারখানা ছিলো। মালিক পুডিলভের নামানুসারে এই কারখানার নাম ক্রাসনি পুডিলোভেৎস্। আজও এই কারখানাটা আছে—সেখানে এখন চাষের জন্য ট্রাক্টর তৈরী হয়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে ট্যাঙ্ক তৈরী হতো।

যাই হোক, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী এই কারখানার বারো হাজার শ্রমিক তাদের দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে হঠাৎ ধর্মঘট করে বসে। এই ঘটনা চারদিকে বেশ সাড়া তোলে। এবং এই শ্রমিকদের সমর্থনে এর চারদিন বাদে অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারী পিটার্স-বুর্গের অন্যান্য কারখানাতেও ধর্মঘট হয়ে যায়। ফলে, সব মিলিয়ে এটা সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হলো।

এই ঘটনায় সম্রাট জার ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রাজ-ধানীতে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য, পুলিশ আমদানী করেন। চারিদিকে যেন বারুদ গন্ধ—আর হাওয়া থমথমে। ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে মালিক আর পুলিশের পক্ষ থেকে নানারকম ভাবে চেষ্টা হতে থাকে।

ভেতরে ভেতরে পুলিশের গুপ্তচর অথচ বাইরে থেকে বেশ ভাল-মানুষ খ্রীস্টান ধর্মযাজক গাপন নামে একজন লোক এই সমস্ত ধর্মঘটীদের বোঝায় যে—তোমরা তো বেশ ভাল মানুষ। খাটো খাও—কারও সাতে পাঁচে থাকো না। ওদিকে সম্রাট জারের মত এমন মহানুভব আর কে আছেন! চল আমরা দল বেঁধে তাঁর কাছে যাবো—আমাদের অভাব-অভিযোগ তাঁকে জানাবো। তিনি দেশের রাজা—আমাদের পিতার মত, তাঁকে আমাদের সুখ-দুঃখের কথা জানাতে দোষ কি?

পাদ্রি গাপনের এই প্রস্তাব সকলেই মেনে নেয়। তারা রাজী হয় রাজার কাছে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে। শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ, আন্দোলন এবং ধর্মঘটের শুরু থেকেই বলশেভিক পার্টির কর্মীরা এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চলেছিলো। এই ধর্মঘট ঘটানোর পেছনে তাদের কিছু মদৎও ছিলো। তাই তারা গাপনের এই প্রস্তাবে সায় দেয় নি—তীব্রভাবেই এর বিরোধিতা করেছিলো। কিন্তু কেউ তাদের কথা শোনে নি। হাজার হাজার শ্রমিকের এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা;—অথচ মালিকের বিরুদ্ধে গলা চড়িয়ে কথা বলবার সাহস তারা প্রায় কিছুই অর্জন করে নি। তাই গাপন-এর শান্তি-মিছিলের প্রস্তাবেই সকলে রাজি হলো।

৯ই জানুয়ারী। রবিবার, সকাল বেলা। বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক মিছিল করে এগুচ্ছিলো জারের 'শীত প্রাসাদ' নামে প্রাসাদের দিকে। হাতে তাদের জারের 'ইকন' বা নানা সাধু-সন্তদের ছবি। মুখে জারের বা ঈশ্বরের নাম-গান। সঙ্গে অনেকেরই স্ত্রী-পুত্র, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ;—আশা জার তাঁদের সামনে দেখা দেবেন—তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনবেন—তাদের জীবন ধন্য হবে। মিছিল আস্তে আস্তে প্রাসাদের সামনে হাজির হয়ে গেল। জয় সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের জয়। জয় রাশিয়ার মহাপ্রতাপান্বিত জারের জয়।

আব ভয় নেই। জারের নির্দেশে তাদের অনেক অভাব এবার মিটে যাবে। সত্যি, গাপনের মত এমন বুদ্ধিমান—এমন ভাল লোক আর নেই।

কিন্তু, ওকি! ও কিসের শব্দ! কেন, কারা আমাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। তাই-তো! ইস্ এ যে একেবারে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সম্রাট তা হলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন বন্দুকেব বুলেট দিয়ে। তাঁব সৈন্যরাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। কি ভয়ানক পৈশাচিক অত্যাচার।

সত্যিই কি ভীষণ অত্যাচার। প্রায় হাজার জনেরও বেশি লোক সেদিন নিহত [খুন বললেই ভালো হয়] হলো। পাঁচ হাজার জনেরও বেশি লোক আহত হলো। বৃদ্ধ-শিশু-নাবী-যুবকের রক্তে রাজপ্রসাদের রাজপথ লাল হয়ে উঠলো। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু-চীৎকারে আকাশ-বাতাস ভরে গেলো। এবং এই রক্তস্রোত আর আর্তনাদ এত মর্মন্তুদ আর ভীষণ ছিল যে তাতেই জারের অত্যাচারের অট্টালিকা অচিরেই ধ্বংস হয়ে গেলো।

এই ঘটনায় সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এই অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতায় শোষিত মানুষেরা চমকে উঠলো। দেশবাসীর জীবনে এই ঘটনা, একটা শিক্ষা, একটা ভীষণ কিছু করার আকাঙ্ক্ষা বয়ে নিয়ে এলো। তাঁরা বিক্ষোভ আর রোষে ফেটে পড়লেন। ধর্মঘট—আর ধর্মঘট—প্রতিরোধ আর প্রতিশোধে সারা দেশের

তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষগুলো মার খাওয়া সিংহের মতো গর্জে উঠলো। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শ্রমিক পাড়াগুলোতে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে জারের সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে লাগলো। গ্রামের কৃষকেরাও চুপ করে বসে থাকলো না। তারাও জমিদারদের ক্ষেত-খামারগুলিকে ধ্বংস করতে লাগলো—চোখের সামনে যা কিছু পেল তাকেই পুড়িয়ে দিতে লাগলো।

এই ঘটনায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায়। জারের অত্যাচারে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদেরই কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিরোধের কাজে নেতৃত্ব দিতে থাকে। জনতার জাগ্রত রোষকে তারা একটা সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে দেশকে একটা সশস্ত্র-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি যে লেনিন রয়েছেন দেশের বাইরে। এই ঘটনায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন—রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-ঘৃণায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দেশে ফেরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লেন। উঃ! আজ যদি তিনি দেশে থাকতে পারতেন, তবে এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে তিনি দাবানল করে তুলতে পারতেন।

যাই হোক, তিনি চুপ করে বসে থাকলেন না। বিদেশ থেকে দেশের কমরেডদের নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন। অভ্রান্ত ভাবে নির্ণয় করলেন যে জারের ঐ অত্যাচার এবং তার ফল হচ্ছে সর্বহারার বিপ্লবের পূর্ব-সূচনা। ঘটনার পরের দিন অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারী জারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জবাবে তিনি লিখলেন 'রাশিয়ায় বিপ্লব' [*Revolution in Russia*] বইটি। এখানে তিনি বললেন ঃ "আঘাতের বদলে আজ আঘাত।....রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, মুক্তির জন্য গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। আজ উত্তর এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম পিটার্সবুর্গের সর্বহারাদের সঙ্গে এক হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। 'মৃত্যু অথবা মুক্তি' মহান পিটার্সবুর্গের সর্বহারা শোষিত মানুষের এই আহ্বান সারা রুশ দেশের মানুষগুলোর অন্তরে ও জীবনে

প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। অতএব বন্ধুগণ তৈরী হও।" লেনিন আরও ঘোষণা করলেন, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। বিদ্রোহী সর্বহারাগণ দীর্ঘজীবী হোক!'

ঠাণ্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ড রুশবাসীর স্মৃতিতে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন হয়ে জেগে রইলো। নানা শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে এই ঘটনার ছাপ পড়তে লাগলো। রুশ দেশের মহান লেখক ম্যাক্‌সিম্ গোর্কী এই পটভূমিকায় রচনা করলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'মা' [*Mother*]।

এই বিপ্লবী পরিস্থিতিতে কাজ চালাতে হবে কি ভাবে, পার্টি কমিটিগুলির কর্মপদ্ধতি কি হবে এ সম্বন্ধে লেনিন সঠিক নির্দেশ পাঠাতেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁর পার্টির ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে তাকে তো অবহেলা করলে চলবে না। তার কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে। তার সংগ্রামের ধরণ ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে। এক কথায় এই বিপ্লবের স্বর্ণউষাকে বরণ করে নিতে হবে। এবং তা পাবে একমাত্র পার্টি কংগ্রেস। কারণ এ তো আর তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়! তাই তিনি পার্টি কংগ্রেস আহ্বান কবার জন্যে বিশেষভাব উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। সময় নষ্ট করা আর চলবে না। শেষে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল অনেকটা লেনিনের আগ্রহেই বলা যেতে পারে, লণ্ডনে এই তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হলো। একটা অগ্নিগর্ভ অবস্থার মধ্যে এই কংগ্রেস শুরু হলো, এবং সেদিক থেকে এই কংগ্রেস ছিলো বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। কিন্তু আরও একটা বিষয়ে এই অধিবেশন মনে রাখবার মত, তা হলো 'দুই কংগ্রেস—দুই পার্টি'। অর্থাৎ লণ্ডনের অধিবেশন বলশেভিক-মেনশেভিক দু-জনেরই, কারণ নীতিগত ক্ষেত্রে ভোটে জয়-পরাজয় ঘটলেও নিয়মসঙ্গত ভাবে তো পার্টি আলাদা হয় নি। তাই দু-মতেরই নেমন্তন্ন হয়েছিল লণ্ডনে। কিন্তু মেনশেভিকরা এই নেমতন্ন গ্রহণ করেনি। তারা ও ঐ একই সময়ে জেনেভায় আর একটা আলাদা কংগ্রেস ডাকলো। পার্টি দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল—মনে, মতে,

কাজে,—দুটি পার্টি।

বলশেভিকদের লণ্ডনের তৃতীয় কংগ্রেসের, আলোচনার মূল বিষয় ছিলো সশস্ত্র বিপ্লব শুরুর সম্ভাবনার, প্রশ্ন, ক্ষেত্র ও পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও বিচার। এই বিষয়টি যে কত গভীর ভাবে, কত তলিয়ে—প্রতিটি পদক্ষেপ কত হিসেব করে ফেলার কথা লেনিন ভেবেছিলেন তা ঐ কংগ্রেসের, কার্য বিবরণী দেখলেই বোঝা যাবে। তিনি প্রায় ১৪০টি মতামত এবং প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ' স্বর্ণকার যেমন কষ্ঠিপাথরে ঘষে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার সোনার মূল্য নির্ণয় করে—ঠিক তেমনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মহান বিশ্বকর্মা লেনিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষেতে চুল চিরে যাচাই করে নিয়েছেন—আগামী দিনে কি করা উচিত বা উচিত নয়। এই কংগ্রেসের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে একাধিক রিপোর্ট সভার সামনে উপস্থিত করা, সশস্ত্র বিপ্লব করা, আপাতত একটা বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করা বা কৃষক-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখা তাঁর পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়েছিলো। তিনি উপসংহারে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট-দের পক্ষে সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠনের তাৎপর্য বিচার করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এক-কথায় অপূর্ব—অশ্রুতপূর্ব।

এই অধিবেশনেই পার্টি'র সভ্য বা সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়ে লেনিনের সূত্র গ্রহণ করা হলো। এবং আজও পর্যন্ত সেই নীতিই কমিউনিস্ট পার্টি'র নিয়মাবলীতে প্রচলিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এই অধিবেশনেই লেনিনকে 'প্রোলেতারি' [*Proletary*] নামক পত্রিকাটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এই পত্রিকাটি 'ইস্ক্রা'র পরিবর্তে প্রকাশিত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা সংবাদ আমার পাঠকদের জানাই যে—দ্বিতীয় কংগ্রেসের শেষে লেনিন যেমন লণ্ডনে কার্ল মার্কসের সমাধি দর্শন করে এসেছিলেন, এবারের অধিবেশন শেষেও কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে মার্কসের সমাধিস্থানটি আবার দেখে

আসেন। এ যেন একলব্যের গুরু-প্রণাম।'

লণ্ডনের তৃতীয় কংগ্রেস শেষ হলো। লেনিন জেনেভায় ফিরলেন। এইখানেই কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে তাঁদের পার্টির অপরভাগের—মেনশেভিকদের অধিবেশন। তিনি বুঝলেন পার্টিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যেমন বুর্জোয়া ধনিক ও মালিক শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মেনশেভিকদের সুবিধাবাদের সঙ্গেও লড়াই চালাতে হবে। প্রথমটা কঠিন ও দুর্গম, কিন্তু দ্বিতীয়টা আবশ্যিক এবং দুঃখজনক।

যাই হোক, তৃতীয় কংগ্রেসের পটভূমিকায় ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় লেনিন কিছুদিনের মধ্যে রচনা করলেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই কৌশল।' এটি জেনেভা থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। আসন্ন বিপ্লবের বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উপরেই তিনি এই গ্রন্থে তাঁর সুচিন্তিত ব্যাখ্যা রাখেন। আসন্ন ঝঞ্ঝার মুখে পার্টির কি কর্তব্য হবে তা নির্দেশ করেন। এবং সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, কর্তব্য, সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের পার্থক্য কতখানি এবং কোথায়, তার বিস্তারিত ও স-উদাহরণ আলোচনা করেন।

এই বই-এর মধ্যে দিয়ে লেনিন বলশেভিকদের মুখপাত্ররূপে রাশিয়ায় বিপ্লবের সমাসন্নতাকে নির্দেশ করলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রূপে। এই বিপ্লবের মূল কর্তব্য হবে—ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটানো, জারতন্ত্রের আমূল উৎপাটন ঘটানো এবং সার্বিক-গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করা। তিনি আরও বোঝালেন যে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকেই বিপ্লব-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এর সঙ্গে সহযোগী হিসেবে এসে দাঁড়াবে গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়। এই ভাবেই সর্বহারা শ্রমিক-সম্প্রদায় এবং কৃষক ভূমিদাসগণকেই বিপ্লবের প্রসার ও পরিচালনার দায়িত্ব পারস্পরিক ভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

লেনিন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আরও বোঝালেন যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া কিছুতেই জারের অত্যাচারের অবসান ঘটানো যাবে না। এর আগে—অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের সেন্ট পিটার্সবুর্গের লড়াই, ক্ষেত-খামারের লড়াই এবং তার আগে-পাছে যে সমস্ত লড়াই-আন্দোলন-ধর্মঘট হয়েছিল তা থেকে অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটবে না ও ক্ষমতা দখলও হবে না। শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই তা সম্ভব হবে। এবং এর জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাময়িক বিপ্লবী সরকার। এই বিপ্লবী রণকৌশল লেনিন রচনা করেছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিকায়।

অপর পক্ষে, মেনশেভিকদের রণকৌশলের পরিচয়ও এই প্রসঙ্গে নিতে হয়। কারণ, উভয়ের তুলনায় বোঝা যাবে যে লেনিনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল কত অভ্রান্ত এবং সুদূরপ্রসারী। মেনশেভিকরা শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের পুরোভাগে আনতে রাজী নয়—আর কৃষক সম্প্রদায়ের যে কোন বৈপ্লবিক শক্তি আছে তা তারা বিশ্বাসই করতো না। তবে কে বিপ্লব পরিচালনা করবে—তাদের মতে—কেন?—যেহেতু এটা বুর্জোয়া বিপ্লব, তাই বুর্জোয়ারাই এর নেতৃত্ব করবে। শ্রমিকরা শুধু তাকে সমর্থন করে যাবে। মেনশেভিকদের এই নীতি ও মতবাদকে লেনিন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন যে, এ ধরণের মতবাদ প্রচার এবং কর্মপন্থা, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ভাবে লেনিন তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থ 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই কৌশল'-এ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তাতে শ্রমিক-কৃষক এবং শহর-গ্রামের আধা প্রলেতারিয়েৎদের অংশ গ্রহণ, মেনশেভিক ভ্রান্তি ও দ্বিচারিতা, এবং আগামী বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টি ইউনিটগুলির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা করেন; যা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের পথে

পৌঁছানোর পক্ষে—সমস্ত পৃথিবীর খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে বিপুল তাৎপর্য বহন করে এনেছিলো। এ কারণেই লেনিনের এই গ্রন্থটি রাশিয়ার অন্যান্য পার্টি ইউনিটগুলির কাছেও অনুমোদন লাভ করে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীর ঘটনার পর সারা রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পিটার্স'বুর্গ, বাকু, লজ, ওদেসা, মস্কো প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ধর্মঘট, শ্রমিক-পুলিশে একটার পর একটা লড়াই ঘটতেই থাকে। সামরিক বাহিনীতেও কেমন যেন একটা বৈপ্লবিক অস্থিরতা দেখা দেয়। জুন মাসে কৃষ্ণসাগর নৌবাহিনীর 'পতিওমকিন' যুদ্ধ জাহাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। এই সব ঘটনাকেই লেনিন বিদেশে বসে দেখছেন—মূল্যায়ন করছেন—প্রয়োজন মত নির্দেশ ও কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করে পাঠাচ্ছেন। অর্থাৎ বিপ্লব—বিদ্রোহ বা ধর্মঘটের প্রত্যেকটি ঘটনাকেই, বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তিনি। এবং স্বাভাবিক ভাবেই তিনি এই পরিস্থিতিতে, ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত সকলকেই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর 'মে দিবসের ইস্তাহারে' বললেন: 'এস আমরা সশস্ত্র হয়ে জেগে উঠি, এবং জারের অত্যাচারতন্ত্রকে উৎখাত করি, ও সমস্ত জনসাধারণের জন্য মুক্তি অর্জন করি। শ্রমিক-কৃষক সকলের জন্যই অস্ত্র চাই।'

এই ভাবে আস্তে আস্তে, ঐ একই খ্রীস্টাব্দের শরতের শুরু থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা তুঙ্গে পেঁছিতে আরম্ভ করলো। এবং শেষে অক্টোবর মাসে সারা দেশের কল-কারখানা, অফিস-কাছারি, ডাক-তার, স্কুল-কলেজ, সব জায়গাতেই ধর্মঘট শুরু হয়ে গেলো। জীবনযাত্রা একেবারে অচল। সর্বাত্মক রাজনৈতিক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে সর্বহারার মুক্তি সংগ্রাম, এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করলো। এই ধর্মঘটে প্রায় দু-লক্ষ কর্মচারী—তার মধ্যে প্রায় এক লক্ষেরও বেশী হচ্ছে শ্রমিক—অংশ গ্রহণ করেন। এই ধর্মঘটের

মূল শ্লোগান ছিলো : 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক!' 'গণতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।'

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের এই শেষের কয়েক মাসকে লেনিন 'ঘূর্ণি-ঝড়ের কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। এই ঝটিকা-সংক্ষোভ রাশিয়ার জারের সরকারকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করলো। তিনি ১৭ই অক্টোবর এক ঘোষণা-পত্রের মারফৎ রুশীয় জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি করবার অধিকারকে এবং আরও কিছু কিছু অভাব-অভিযোগকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। জনসাধারণকে বিপ্লব-বিমুখী করতে জারের এই টোপ লেনিন মোটেই গ্রহণীয় বলে মনে করলেন না। তবুও জার যে ঘাড় নোয়াতে আরম্ভ করেছে এটা বুঝেই তিনি সর্বহারা কৃষক-শ্রমিকের বিপ্লবকে আরও ব্যাপক-নিশ্চিত ও দ্রুত করার দিকে পরিচালনা করতে থাকলেন।

এই রাজনৈতিক ধর্মঘটের মৃত্তিকায় এবং মুক্তি সংগ্রামীদের রক্তে উর্বরতা লাভ কোরে, পৃথিবীর প্রথম সর্বহারা জনসাধারণের রাজ-নৈতিক সংগঠন—'শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত' অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এবং এই বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের মধ্যে বহু শহরে এবং শ্রম-কেন্দ্রগুলিতে এই ধরণের বহু সোভিয়েত গড়ে উঠতে থাকে। লেনিন তাঁর দূরদৃষ্টি থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে এই সোভিয়েতগুলিই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা গ্রহণ করবে। সেই উপলক্ষেই তিনি আইনানুমোদিত ও বলশেভিক সংবাদ-পত্র 'নোভায়াঝীজন্' ['নবজীবন']-এর সম্পাদকের উদ্দেশ্যে 'আমাদের কর্তব্য এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত' শিরোনামে একটি পত্র রচনা করেন।

কিছুদিন আগে থেকেই বিপ্লবী পরিস্থিতি ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছে। চারিদিকে ধর্মঘট, প্রতিরোধ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। তাই এই অবস্থায় কিছুতেই লেনিনের পক্ষে আর বিদেশে থাকা চলছিলো না। যদিও দেশের ফেরার ঝুঁকি অনেক,—তবুও,

তিনি কিছুতেই এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে কাছে থেকে, সামনে গিয়ে দেখে—নেতৃত্ব না দিয়ে আর পারছিলেন না। শেষে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তিনি কোন বিপদ-বাধা না মেনেই পিটার্স-বুর্গে গিয়ে হাজির হলেন। এবং একেবারে সামনে থেকে সরাসরি পার্টি ও তার বিপ্লবী কর্মপন্থাকে পরিচালনা করতে থাকলেন। কাছে থেকে—পাশে থেকে বক্তৃতায়, লেখায়, নির্দেশে তিনি বলশেভিকদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্যে উৎসাহিত করে তুলতে থাকলেন।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হবে, যাতে করে বোঝা যাবে যে শ্রমিক ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁর স্নেহ ও প্রীতি কত গভীর ছিলো। যে দিন তিনি পিটার্সবুর্গে পৌঁছান সেই দিনই প্রিয়োব্রাজেনেস্কি কবরখানায় গিয়ে 'রক্তাক্ত রবিবারে'র শহীদদের সমাধিগুলি দেখে আসেন। মৃত্যু স্তব্ধ সেই সকল নিরীহ মানুষগুলির সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অভিভূত হয়ে যান—গভীর দুঃখে তাঁর মাথা নুয়ে আসে।

যাই হোক, লেনিনের উপস্থিতির ফল হিসেবেই বোধ হয়, ৫ই ডিসেম্বর সমগ্র মস্কো শহরে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হলো। এবং ৭ই সারা অঞ্চলে প্রায় সহস্রাধিক ব্যারিকেড গড়ে তুলে শ্রমিকেরা সশস্ত্র হয়ে জারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিলো। দীর্ঘ নয় দিন ধরে প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে এবং নির্ভয়ে শ্রমিকেরা লড়াই চালিয়ে গেলেন। পিটার্সবুর্গের কেন্দ্র থেকে জারের সৈন্য পাঠানোর চেষ্টাকে নানাভাবে বানচাল করার আয়োজন হলো—রেলপথ উড়িয়ে দিয়ে, সৈন্যদের মধ্যে থেকে বিদ্রোহী মনোভাবের লোকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে এবং শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ হয়। জার 'সেমিয়োনভ রেজিমেণ্ট'কে বিদ্রোহ দমনের কাজে পাঠাতে সক্ষম হন এবং শেষ পর্যন্ত মস্কো অভ্যুত্থানকে কঠোর হাতে দমন করা হয়।

মস্কো উত্থানের এই শিহরণ সৃষ্টিকারী লড়াইয়ের একটি উদ্দীপ্ত

লেখা-চিত্র রচনা করেছিলেন রাশিয়া, তথা পৃথিবীর, অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কী। তিনি সেই সময়ে মস্কোতেই ছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'সবে রাস্তা থেকে ঘরে এলাম। দেখলাম চারিদিকে লড়াই চলছে। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী শোষণ মুক্তির জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে লড়াই করছে। লড়াই চলছে সান্দুনভ স্নানাগারের কাছে, নিকলায়েভ স্টেশনের রাস্তায়, স্মলেনস্ক বাজারের কাছে, কুদ্রিনোতে। সবচেয়ে মরিয়া লড়াই হচ্ছে প্রেসনিয়াতে। চমৎকার লড়াই। চমৎকার লড়ছে শ্রমিকেরা।'

মস্কোর সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে পরেই, ডন নদীর তীরবর্তী রস্তভে, নিঝনি-নভগরোদ, উফা, চিতা ইত্যাদি নানা সহরেই বঞ্চিত মানুষেরা তাদের নেতা লেনিনের আদর্শে লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। চতুর্দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে—'বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে।'

কিন্তু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এই বিদ্রোহের মধ্যে একটা কেন্দ্রীয় সংহতি না থাকায়—ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ এক বিরাট দাবানল সৃষ্টি করতে পারলো না। জারের সৈন্যদল কঠোর হস্তে এই সব অভ্যুত্থান-গুলিকে দমন করলেন। অত্যাচার ও পীড়ন, ফাঁসি-জেল আর নির্বাসনের রোলার চালিয়ে জনগণের মনোবল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? বুকে পাষাণ চাপিয়েও কি প্রহ্লাদকে হত্যা করা যায়? মেঘ কি সূর্যকে চিরকালের জন্যে ঢেকে রাখতে পারে? আগুন কি চিরদিন ছাই চাপা থাকে? এ ক্ষেত্রেও তা থাকে নি।

লেনিন তাঁর দিব্যদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা থেকে লিখলেন যে : '১৯০৫-এর ডিসেম্বরের আগে রাশিয়ার জনগণ তাদের শোষণকারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। কিন্তু ডিসেম্বরের ঘটনার পর তারা আর সেই মানুষ রইলেন না। তাঁদের পুনর্জন্ম ঘটলো। তাঁরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। তাঁরা বৈপ্লবিক ইস্পাতে পরিণত হলেন। তাঁদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সৈনিকগণ।' সত্যিই, ধরণীর ধন কিছুই ফেলা যায় না। যে নদী মরুপথে তার স্রোত হারায়, সেও একেবারে শেষ হয়ে যায় না।

এই ব্যর্থতাকে নিজেদের পক্ষে প্রচারের এক অপূর্ব সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলো মেনশেভিকরা। বলশেভিকদের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং তার পরাজয়কে তারা রাজনৈতিক হঠকারিতা বলে বর্ণনা করলো। তাদের নেতা প্লেখানভ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রচার করতে লাগলো যে, 'প্রলেতারিয়েতদের কিছুতেই অস্ত্র ধরা উচিত নয়।'

কিন্তু লেনিন কোন রকমেই এই মত মানতে পারলেন না। তিনি তাঁর 'মস্কো অভ্যুত্থানের শিক্ষা' নিবন্ধে বললেন যে একটা পরাজয়, বা একটি ব্যর্থতা দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিচার করা যায় না। এখানে যে ব্যর্থতা, সে আমাদের রণকৌশলের [war tacticts] অসাফল্য হতে পারে। তাকে সংশোধন করা যেতে পারে। তাকে আরো সঠিক এবং সুদৃঢ়ও করা যায়। কিন্তু যে জনসাধারণ একবার সংগ্রামের স্বাদ পেয়েছে—তাকে সেখানে থেকে হটানো একেবারে আত্মহত্যার সামিল হবে। ঢেউ সামনের দিকেই গড়ায়। তিনি এখানে পরিষ্কার ভাবে ফতোয়া দিলেন যে, জার সরকারের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। দোদুল্যমান ইউনিটগুলির সৈন্যদের নিজেদের পক্ষে টেনে আনবার জন্যে আরও সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করতে হবে। সকলকে একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্যে টেনে আনতে হবে—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত—সব্বাইকে।

১৯০৫-এর উত্তেজনা ১৯০৬-এ পৌঁছে পিছিয়ে পড়লেও থেমে গেল না। কোথাও তা ধিকি ধিকি করে—কোথাও বা তা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠতে লাগলো। এরই মধ্যে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গত ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতাকে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে লেনিন মস্কো এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের মধ্যে থেকে

তাদের বীরত্ব এবং সাহসকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করলেন। বিদ্রোহ দমনের পর জারের অত্যাচারের স্বরূপটিকেও বিশেষ ব্যথা ও দুঃখের সঙ্গে অনুভব করলেন, এবং উদ্দীপনার সঙ্গে জানালেন যে, তারা যেন কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে না পড়ে। সামনে আরো কঠিন লড়াই—আরও জোর তুফান।

এই ভাবে কোথাও সাফল্য, কোথাও ব্যর্থতা, কোথাও বা সমস্ত পরিস্থিতির বিচারে, বিরাট রাজনৈতিক শিক্ষালাভের মধ্যে দিয়ে, লেনিন সমগ্র রাশিয়ার সংগ্রামী মানুষগুলির পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। চতুর্দিকে জারের গুপ্তচর। পুলিশ পাগলা কুকুরের মত তাঁকে ধরবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে নির্ভীক, অদম্য কর্মী লেনিন, সর্বত্র কাজ করে চলেছেন। অসংখ্য প্রবন্ধ, পুস্তিকা এবং গ্রন্থ রচনা করছেন। কত জায়গায় যান—কত সম্মেলনে, কত সমাবেশ-সভায় যে বক্তৃতা দিয়ে ফেরেন তার ইয়ত্তা নেই। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, তাঁদের আগামী কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতে থাকেন। জারের পুলিশ ও গুপ্তচরেরা ছায়ার মত তাঁর পেছনে লেগে থাকে—তবুও শঙ্কাহীন ভাবেই মুক্তি-সংগ্রামের দূত হিসেবে কাজ করে চলেন তিনি।

এরই মধ্যে পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস-এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই যে পবিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এবং সামনে যে কর্তব্যভার এসে হাজির হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির বর্ধিত অধিবেশন বা কংগ্রেস আহ্বানের প্রশ্নটি একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কর্মীদের দুটি ভাগ [বলশেভিক-মেনশেভিক]-এর মধ্যে মিলনের দিকটিকেও লেনিন প্রাধান্য দিতে চাইলেন। এই দু-দিকে-লক্ষ্য রেখে তিনি চতুর্থ কংগ্রেস ডাকতে চাইলেন। এই কারণে এই কংগ্রেস 'চতুর্থ বা ঐক্য কংগ্রেস' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

লেনিনও উভয় গ্রুপের মধ্যে মিলন চাইলেও তাঁর মত ছিল যে এই মিলন হবে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক আদর্শ এবং সাংগঠনিক

ভিত্তিতে। উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রশ্নে লেনিন ওপরের ঐ মূল ভিত্তিটিকে প্রধান করে তুললেন। সেই জন্যে চতুর্থ [ঐক্য] কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্যে লেনিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করলেন। এবং এই কংগ্রেসে বলশেভিকরা কৌশলগত ভাবে কোন পথ গ্রহণ করবেন তার খসড়াও তিনি রচনা করলেন। এ ছাড়া এই কংগ্রেসে কৃষি কর্মসূচীর ওপরই সবচেয়ে জোর দেওয়া হলো। এবং অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রায় একমাস আগে [মার্চের মাঝামাঝি] তাঁর লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হলো—নামঃ 'শ্রমিক পার্টির কৃষি কর্মসূচীর পুনর্বিচার' [*Revision of the Agrarian Programme of the Workers Party*]

শ্রমিক পার্টির দুই শাখার মধ্যে ঐক্য সাধন ছাড়াও আরও একটা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য ছিল এই কংগ্রেসের। তা হচ্ছে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রয়োজনে—একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে, রাশিয়ার তাবৎ জাতিগুলির অন্তর্গত শ্রমিক সংগঠন ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও দৃঢ় সংহতি স্থাপন করা। যেমন পোলীয়, লিথুয়ানীয়, লাতভীয় প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবে কর্মরত শ্রমিক পার্টিগুলিকে একত্র সংহত করা।

যাই হোক, অবশেষে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল [নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী] সুইডেন রাষ্ট্রের স্টকহোমে চতুর্থ [ঐক্য] কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। চলে ৮ই মে পর্যন্ত। এতে যোগ দেবার জন্য লেনিনও এসে উপস্থিত হলেন। সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কমরেডরা এই অধিবেশনের জন্যে 'জনভবন'টি [People's House] সংগ্রহ করে দেন। লেনিন এই কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন এবং এবারের অনেকগুলি অধিবেশনেই তিনি সভাপতিত্ব করেন। রিপোর্ট উপস্থিত করেন—কৃষি সমস্যা এবং 'বর্তমান মুহূর্তে প্রলেতারীয় শ্রেণীর কর্তব্য' সম্পর্কে। আগামী দিনে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান এবং তার সাংগঠনিক রূপ কেমন হবে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ যুক্তি সমৃদ্ধ বক্তৃতা দেন। এবং সর্বোপরি 'রুশ

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র [R. S. D. L. P.] নিয়মাবলী কি হবে—তার খসড়া তৈরীর কমিশনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু এত করেও মেনশেভিকদের সঙ্গে কৃষি-সমস্যা এবং কৃষক প্রশ্নে কিছুতেই মতৈক্য হলো না। পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করতে থাকলেন। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকগণ জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত ও সমস্ত জমির জাতীয়করণ-এর পক্ষপাতি। অপর পক্ষে, মেনশেভিকগণ জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত না করে, একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে রেখে, ইজারার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবার পক্ষপাতি। লেনিন এই ব্যবস্থাকে বললেন, জমিদারদের সঙ্গে মিটমাটের ব্যবস্থা; অহিংস উপায়ে কৃষক-সমস্যা সমাধানের এক মনোবম দিবাস্বপ্ন। কিন্তু লেনিনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও মেনশেভিকদের সমস্ত প্রশ্ন—সকল প্রস্তাব ভোটের জোরে পাশ হয়ে যায়। বলশেভিকদের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন স্থানের গণআন্দোলনে ব্যস্ত অথবা জারের নিপীড়নের মুখোমুখি থাকার ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই এই পরাজয়।

মার্কসবাদের বিপ্লবী চেতনায় দৃঢ় আস্থাসম্পন্ন লেনিন জানতেন যে, আজকের পরিস্থিতিতে মেনশেভিকদের আপোষকামী মতবাদ পরাজিত হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, উক্ত কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, রাশিয়ার বিভিন্ন জাতীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিকে একমাত্র 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র [R. S. D. L. P.] মধ্যে এনে সংহত করতে হবে। এর ফলে সমস্ত স্তরের এবং বিভিন্ন জাতিব শ্রমিকদের ওপর বলশেভিকরা, তথা লেনিন, আপন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন। এবং ঠিক এই সুযোগে তিনি 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ঐক্য কংগ্রেস এবং তার রিপোর্ট' [সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের প্রতি পত্র] নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ

করেন [জুন, ১৯০৬]। এই পুস্তিকার মধ্যে দিয়ে তিনি সর্বশ্রেণীর শ্রমিকদের কাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক কর্মীদের ভেতরেও, চতুর্থ [ঐক্য] কংগ্রেসের ফলটি এবং মেনশেভিকদের যথার্থ পরিচয়টি তুলে ধরার সুযোগ পান।

এই সমস্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং মতাদর্শগত লড়াই-এর মাঝেও কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলন থেমে থাকে নি। কেন না, আমরা দেখছি যে এর কিছু পরেই ১৭ই জুলাই সেভ্‌বুর্গ বাহিনীর সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ১৯শে জুলাই ক্রোনস্তাদেও এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছালো। সেখানেও বিদ্রোহ দেখা দিলো। লেনিন প্রস্তাব করলেন যে, এই দু-জায়গায় অভ্যুত্থানের সমর্থনে পিটার্সবুর্গে এক সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হোক ঃ কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হলো না। সেভ্‌বুর্গ এবং ক্রোনস্তাদ এই দুই জায়গার বিদ্রোহ-ই জার চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করলো।

চতুর্থ [ঐক্য] কংগ্রেসের পর থেকে লেনিন আরও বেশি বেশি করে ছাত্র-শ্রমিক-অফিস কর্মচারী ইত্যাদি সর্বস্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলেন। ১৯০৫-এর প্রথম বিপ্লবের পর তিনি যে কি ব্যাপকভাবে বাস্তব কর্মসূচী এবং ঘনিষ্ঠ গণসংযোগ গড়ে তুলেছিলেন, তার সব কথা—আজ এই প্রায় আশি বছর পরে, ঠিক ঠিক ভাবে আর জানবার উপায় নেই; —তবুও আজ এটা উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধেই হয় না যে, সেদিনের সেই উদ্যোগ আয়োজনের ফলেই তো ১৯১৭-য় রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম সর্বহারার বিপ্লব সম্ভব হয়েছিলো। সবার অলক্ষে বীজ যে প্রাণাবেগ ও জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে, তার জোরেই সে একদিন সতেজ সবুজ গাছ হয়ে মাটির ওপর মাথা তুলে দাঁড়ায়—এখানেও ঠিক তাই হয়েছে।

এই সময়ে, ৯ই মে তারিখে কার্পভ এই ছদ্মনাম নিয়ে পিটার্সবুর্গের 'পানিনা জন-ভবন'-এর প্রায় তিন হাজারেরও বেশী এক জনসমাবেশে ভাষণ দেন লেনিন। এই বক্তৃতার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে, এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি

যেমন একদিকে বলশেভিক কর্মীদের আগামী কর্তব্যের নির্দেশ দিলেন—তেমনিই মেনশেভিক, বুর্জোয়া কাদেত ইত্যাদি পার্টি-গুলির প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের পরিচয় এবং তার বিপদ সম্বন্ধেও অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। শ্রোতারা একান্ত মনোযোগ ও গভীর উত্তেজনা এবং আগ্রহের সঙ্গে লেনিনের এই বক্তৃতা শোনেন। স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি ব্যক্তি যেন লেনিনের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁর প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেদের প্রচণ্ড আন্দোলনের জন্যে দৃঢ়সংকল্প করে তুলছিলো।

কিন্তু এর মধ্যে আরও একটা কাজ তাঁকে করে যেতে হচ্ছিল—তা হচ্ছে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ানো। এই সময় তাঁকে, আর তাঁর স্ত্রী ক্রুপস্কায়াকে কতবার যে নাম পালটাতে—বাসা পালটাতে, পাশপোর্ট পালটাতে হয়েছে তার আর হিসেব নেই। সাংগঠনিক বিরাট দায়িত্বের মধ্যেও পুলিশের সঙ্গে তাঁকে যে কি ভয়ানক চোর-চোর খেলতে হয়েছিল তার ঠিক কি! যেমন, কোন একটা মিটিং শেষ করে তিনি হয়তো বাড়ী ফিরছেন,—পথেই বুঝতে পারলেন যে পুলিশের লোক তাঁর পিছু নিয়েছে,—অমনি তাঁকে পথ ও গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে সেই রাতটা অন্য এক জায়গায় কাটিয়ে দিতে হলো। ক্রুপস্কায়া কতবার যে এমনিভাবে তাঁর আসার অপেক্ষায় জানালার ধারে বসে বসে রাত কাটিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শেষে তো একবার গোয়েন্দা পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, ক্রুপস্কায়াকে কিছু দিনের জন্যে ছোট বোন মারিয়ার কাছে রেখে দিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

এই মাসে, অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের একেবারে শেষে, দ্বিতীয় বারের জন্যে বিদেশে আত্মগোপন করার আগে, কিছুদিন—মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়ে—ফিনল্যাণ্ডের ভাসা নামক স্থানের এক গ্রাম্য কুটিরে লেনিন লুকিয়ে ছিলেন। এই আত্মগোপনের সময় লেনিন কর্মজগত বা বাইরের সমাজের থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি এখান থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন—এখান

থেকেই তিনি পঞ্চম কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্যে কোপেন-হেগেন হয়ে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। এই গ্রামে অনেক সময়েই বলশেভিক কমরেডদের নেতৃস্থানীয়রা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হতো। এবং এই ফিনল্যাণ্ড থেকেই বে-আইনী সংবাদপত্র 'প্রলেতারি' প্রকাশিত হতে থাকে [অগাস্ট, ১৯০৬]। এটাকে বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র বলা যেতে পারে। যদিও এটার পরমায়ু ছিল মাত্র তিন বছর, তবুও এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ ও উদ্যম দুই-ই লেনিনকেই নিতে হয়েছিলো। এতে লেনিনের প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এর-ই মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সময়টা ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ। লেনিন মেনশেভিকদের ভণ্ডামি এবং কপটতাব স্বরূপ উন্মোচন করে 'সেণ্ট পিটার্সবুর্গের নির্বাচন এবং একত্রিশ জন মেনশেভিকের ভণ্ডামি' নামে একটি ইস্তাহার রচনা করেন। এই ইস্তাহার যেন মেনশেভিকদের মধ্যে বোমা ফাটালো। মেনশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা আহূত একটি 'পার্টি বিচার-সভা'র সামনে দাঁড়াতে লেনিনকে বাধ্য করা হলো। লেনিন নানা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা এই বিচার-সভার সামনে মেনশেভিকদের ঐক্য বিনাশকারী অসংখ্য কাজকর্মের নমুনা তুলে ধরেন। এই বিচার-সভার মাত্র দু-টো অধিবেশন বসেছিলো।

এদিকে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলতে লাগলো। লেনিনের মূল আস্তানা ফিনল্যাণ্ডের ভাসায়। অবশ্য তারই মধ্যে, পালিয়ে লুকিয়ে এদিক ওদিক চলাফেরা তো চলছেই। ডেনমার্কের প্রখ্যাত শহর কোপেনহেগেনে, পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস বসাবার সব ব্যবস্থাই করা হলো। লেনিন এসে হাজির হলেন। তিনি, পার্টির বলশেভিক প্রতিনিধিদের এক জায়গায় সমবেত করে, কিভাবে সৈন্য সংঘ গড়া যায়, তার বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। এমন সময়, ডেনিশ পুলিশ সহসা এসে হাজির হয়ে, তাঁদের বারো ঘণ্টার মধ্যে ডেনমার্ক রাষ্ট্রের সীমানা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলো। কি

আর করা যাবে। সম্মেলনকে লণ্ডনে সরিয়ে নিয়ে যেতে হলো। যাবার পথে লেনিন বার্লিনে থেমে রুশ দেশের প্রখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীকে সঙ্গে নিয়ে নেন—সম্মেলনে যোগদানকারী একজন সদস্য হিসেবে। যদিও এই সময়ে গোর্কী খুবই অসুস্থ ছিলেন—তবুও তিনি লেনিনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে লণ্ডন শহরের উপান্তে 'সংশোধিত গীর্জা'র [Reformed Church] এক বাড়ীতে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র ঐতিহাসিক পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলো। এখানে প্রায় ১৪৭,০০০ পার্টি সদস্যের প্রতিনিধি হিসেবে মোট ৩৩৬ জন প্রতিনিধি হাজির হন। আর গত চতুর্থ কংগ্রেসের মত নয়—এখানে বলশেভিকরা রীতিমত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। এছাড়া পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধিগণও বলশেভিকদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলি সমর্থন করেছিলেন।

লেনিন এবারেও প্রেসিডিয়ামে নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসের সাতটারও বেশী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন তিনি। এবং এবারেও তাঁর প্রধান আক্রমণ পরিচালিত হয় রাশিয়ার বুর্জোয়া পার্টি-গুলির প্রতি লক্ষ্য করে। এবং এই সমস্ত পার্টিগুলি সম্পর্কে তিনি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাও কংগ্রেসে সহজেই গৃহীত হয়ে যায়। তিনি এই প্রস্তাবে বুর্জোয়া পার্টিগুলির শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করেন, এবং শ্রমিক শ্রেণীকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে তাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত এবং কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে. উদারনৈতিক কাদেত পার্টির গণতন্ত্রের ভণ্ডামীকেও তিনি আক্রমণ করেন। পরিশেষে, যে অভ্যুত্থান ঘটে গেল এবং যার সম্ভাবনা পুনরায় প্রায় সমাগত,—তার প্রশ্নে বলশেভিকদের অনুসৃত কর্মপন্থা সঠিক বলে এই কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হলো। অপরাপর অন্য অনেক বিষয়েই, বলশেভিকদের মতাদর্শ—কর্মপন্থা এবং নীতি প্রতি স্তরেই বিরাট বিজয় অর্জন করলো। গত চতুর্থ কংগ্রেসের

প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল যেন এবারে—তাছাড়া, বর্তমান সময়ে কংগ্রেসে বলশেভিকদের এইভাবে জয়লাভ, নানাদিক থেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো।

আগেই বলেছি যে, বার্লিন হয়ে আসার পথে লেনিন ম্যাক্সিম গোর্কীকে এই অধিবেশনে যোগদান করবার জন্যে, আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। গোর্কী পরবর্তীকালে, এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা রচনা করেন। যার মধ্যে দিয়ে লেনিনের এক উজ্জ্বল মূর্তি ভাস্বর হয়ে ওঠে। সেই স্মৃতিকথার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "কংগ্রেসে বক্তৃতার বা আলোচনার মধ্যে, বড় বড় বা ভালো কথা বলার দিকে ঝোঁক ছিল না লেনিনের। কিন্তু খুব সহজ ভাবে, খুব সাধারণ কথায়, একেবারে ঠিক কথাটি তিনি বলতেন—যা গিয়ে একেবারে শ্রোতাদের মনের মধ্যে গেঁথে যেতো। অন্য বক্তাদের চেয়ে লেনিন খুবই কম সময় নিয়েই বলতেন—কিন্তু শ্রোতাদের হৃদয়ে তা দাগ ফেলতো অনেক গভীর করে।....এবং এটা শুধু আমারই মনের কথা তা-ই নয়—সম্মেলনের আরও অনেকে ফিস্‌ফাস্ করে বলতো: 'উনি যা বলেন একেবারে সার কথা'।.... লেনিনের বক্তব্যের প্রতিটি যুক্তি ছিলো যেমন জোরালো, তেমনি অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে ঋজু।"

মানুষ ও নেতা লেনিনকে ফুটিয়ে তুলতে আমরা এখানে গোর্কীর স্মৃতিকথা থেকে আরও কিছু কথা উদ্ধার করবো। তিনি লিখেছেন: "এমন অনেক শ্রমিক-প্রতিনিধি কংগ্রেসে এসেছিলেন যাঁদের কেউ কেউ এর আগে লেনিনকে চোখে দেখেন নি। তাঁদেরই মধ্যে কিছু কিছু প্রতিনিধি লণ্ডনের হাইড পার্কে বেড়িয়ে বেড়াবার সময়, কথোপকথন প্রসঙ্গে, বা লেনিনকে দেখে, তাঁদের কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই বিষয়ে বলেছেন: 'এখানকার কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো লেনিনের মত বুদ্ধিমান থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে এর আগে আমি পৃথিবীর অন্য কাকেও এ ভাবে আমার সমস্ত সত্তা দান করিনি।'

আর একজন শ্রমিক একটু হেসে বললেন : 'তিনি আমাদেরই একজন।'

অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন : 'কেন, প্লেখানভও তো আমাদেরই। তৎক্ষণাৎ আর একজনের কাছ থেকে উত্তর এলো : 'প্লেখানভ,—তিনি আমাদের শিক্ষক, একজন সুন্দর ভদ্রলোক। কিন্তু লেনিন আমাদের নেতা, এবং আমাদের সাথী [কমরেড]'।

পাশের একজন যুবক-কর্মী কাষ্ঠ-হাসি হেসে টিপ্পনি কাটলো : 'হ্যাঁ, প্লেখানভ কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে, তিনি ফ্রক-কোট পরে আছেন'।"

পঞ্চম কংগ্রেসের পর একটা জিনিষ বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের সেই ভয়ঙ্কর 'রক্তাক্ত রবিবার'-কে কেন্দ্র করে যে বিপ্লবের শুরু হয়েছিল, তা গত দু-বছরের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এসে, পরাজয়ের ভেতর শেষ হয়েছে। অতএব প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে। তা হোক—কিন্তু তার ফল—তার সুদূর-প্রসারী প্রভাব—তার উন্মাদনা ও শিক্ষা যাবে কোথায় ? সেটা তো নষ্ট হবার নয়! সারাদিন ধরে সূর্য জীবন-আলোক বিতরণ করে অস্ত গেলেও—পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এলেও—প্রাণকোষে যে জীবনানুভূতি জাগিয়ে দিয়ে যায়, তা-ই আগামী দিনের নব-প্রভাতের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে আসে।—১৯০৫-ও তেমনি ১৯১৭-এর সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করলো। এটা বুঝেই, লেনিন ১৯০৫-এর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত কর্মপদ্ধতিকে ঢেলে সাজিয়ে, ঝাড়াই-বাছাই করে নিতে লাগলেন। পুলিশের আক্রমণ ও ভেতরে-বাইরের প্রতিক্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়েও নতুনভাবে সব কিছু গড়ে তুলে নিতে লাগলেন তিনি।

অন্যদিকে, জারের পুলিশ-বাহিনী, গোয়েন্দা-দপ্তরও, তাদের আক্রমণ-পদ্ধতির কলি-ফিরিয়ে নিতে লাগলো। লেনিনকে চাই-ই চাই। ওকে ধরে, এবার একেবারে শেষ করে দিতে হবে। তাই ফিনল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করবার চেষ্টা হতে থাকলো—

যাতে তারা ভ্লাদিমিরকে ধরে তাদের হাতে সমর্পণ করে। সর্বত্র সতর্ক প্রহরা— চারিদিকেই গোয়েন্দা ও পুলিশের জাল পাতা। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে লেনিনকে ফিনল্যাণ্ডের আরও ভেতরের দিকে চলে যেতে হলো। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না। আর এদেশে থাকা যাচ্ছে না। আবার কি দেশ ছাড়তে হবে!

এর মধ্যে 'বারো বছর' [*Twelve Years*] নাম দিয়ে, তাঁর কিছু নির্বাচিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধের সংকলনটি ১৯০৭-এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হলো [প্রথম সংস্করণের আখ্যা পত্রে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের তারিখ দেওয়া আছে]। ইচ্ছে ছিল, তিনি তাঁর সমগ্র রচনাকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করবেন। কিন্তু এই প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়া মাত্রই সেন্ট পিটার্সবুর্গের আদালত বইটিকে 'নিষিদ্ধ পুস্তক' বলে ঘোষণা করে দেয় [নভেম্বর, ১৯০৭]। আদালত আরও ঘোষণা করে যে রাশিয়ার সম্রাটের প্রবলতম শত্রু, লেনিনের সব লেখা এবং বই-পত্তর বাজেয়াপ্ত করো—নষ্ট করো—পুড়িয়ে ফেলো। এবং বিশেষ করে এখনই, তাঁর লেখা 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুটি কৌশল' [*Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution*] বইটি নষ্ট করে ফেলো [২২ ডিসেম্বর, ১৯০৭]।

ফিনল্যাণ্ড তাঁকে শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হলো। রাশিয়া এবং তার আশে-পাশের সব জায়গাই এখন তাঁর পক্ষে বিপদজনক। তাই বলশেভিক কেন্দ্রগুলি সিদ্ধান্ত করলো যে লেনিনকে নিরাপদে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক হলো যে, পার্টির মুখপত্র 'প্রলেতারি'র প্রকাশ-স্থানও সরিয়ে ফেলতে হবে।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে [?] লেনিন ফিনল্যাণ্ড ছাড়লেন। কিন্তু চতুর্দিকে যে পুলিশের চর, গোয়েন্দাদের শিকারী-কুকুর-সুলভ দৃষ্টি ছড়ানো—তাই ফিনল্যাণ্ড ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবু যেতেই হবে—উপায় নেই। সেই কারণে, তিনি ফিনিশীয় অঞ্চল হেলসিংফোর্স হয়ে এবং এবো [Abo] পাড়ি দিয়ে

বিদেশে পৌঁছাবেন ঠিক হলো। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—পথ অত্যন্ত কষ্টকর ও দুর্গম। কিন্তু উপায় নেই, তাঁকে চলে যেতেই হবে—তাঁকে পিতৃভূমির দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-পবিজনেব স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করতেই হবে। দুঃখ সয়েই দুঃখকে জয় করতে হবে। মরণ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই তো, নবজাতকের আবির্ভাব ঘটবে।

ফিনল্যাণ্ড থেকে তাঁর পালাবার যে পথ ঠিক হয়েছিল, তার খানিকটা রেল গাড়ীতে করে যেতে হয। তিনি যেতে যেতে অনুভব কবলেন যে, কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ করছে : ইস্, আর তো রক্ষে নেই। তিনি বুদ্ধি কবে মাঝ পথেই গাডী থেকে নেমে, পাযে হেঁটেই যেতে মনস্থ কবলেন। সেইমত ট্রেন থেকে তিনি নেমে পড়লেন এবং গভীর অন্ধকার রাত্তির ও ডিসেম্বরের মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে পাযে হেঁটে চলতে থাকলেন। ফলে, তার পরেব দিন সকালে তাঁরপৌঁছাতে দেরী হযে গেল। গন্তব্যস্থলে গিয়ে দেখেন তাঁকে নিযে যে স্টিমারের স্টকহোমে পৌঁছে দেবাব কথা ছিলো, সেটা ছেড়ে গেছে। কি করা যায—উপায় কি! অনেক ভেবে চিন্তে—দু-জন স্থানীয কমরেডের সাহায্যে স্টিমারটিব পরবর্তী থামবার জাযগার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। রাস্তা কম কববার জন্যে, বরফে ঢাকা ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরেব ওপর দিযে তিনি হাঁটতে লাগলেন। তখনও বরফ খুব শক্ত হয়ে জমেনি। পদে পদে বিপদ—যে কোন মুহূর্তে ববফেব চাংড়া ধ্বসে তাঁরা জলে ডুবে যেতে পারেন। তবুও তিনি 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে, কোন ভযকেই আমল না দিযে, সেই আধ-শক্ত বরফের ওপর দিযেই হেঁটে চললেন। শেষে, ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই ঘটলো। পায়ের চাপে বরফ ভেঙ্গে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। শেষে সঙ্গী কমরেডদের সাহায্যে কোন রকমে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন। এই সময়ের মনোভাবকে বর্ণনা করে পরে তিনি বলেছিলেন : 'ইস্, কি বোকার মতই না মরতে হচ্ছিল' ['What a stupid way to die']।

এইভাবে জীবন-মরণের মুখোমুখি হয়ে—অনেক দুঃখ-কষ্টের পর,

তিনি জার, আর তার পুলিশের নজর এড়িয়ে প্রবাসে চলে এলেন। তাঁর দ্বিতীয় বারের প্রবাস জীবন-যাপন আরম্ভ হলো। এবারের তাঁর দেশান্তরে থাকার সময়টা অনেকখানি—প্রায় দশ বছর।

লেনিন দেশ ছাড়লেন। প্রায় আড়াই বছর ধরে চলা, শোষিত জনগণের প্রথম বারের অভ্যুত্থান, জারের অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে দিয়ে শেষ হতে চললো। কিন্তু অপরদিকে, জারের স্বৈরাচার ও শোষণের প্রাসাদের ভিতেও ফাটল ধরেছে।—সমস্ত পুরাতন কায়দার অত্যাচার ও গরীবের রক্ত-চোষার ব্যবস্থা থমকে দাঁড়িয়েছে। সুখের প্রমোদ-ভবনে যে নাড়া লেগেছে, তা তো আর থামলো না। বিসুবিয়াস আপাতত ঘুমিয়েছে বটে—কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই তা আবার আগুন ওগরাতে পারে। মানুষের সুখ-হাসি-আনন্দ কেড়ে নিয়ে তৈরী, সম্রাটের বিলাস-কানন বিপ্লবের লাভা-স্রোতে কখন যে চাপা পড়বে—তা কে বলতে পারে? সারা পৃথিবী বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে দেখছে যে, সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির রাজপথ তৈরী হচ্ছে রাশিয়ায়। লেনিনের বা বলশেভিকদের অনুসৃত মতাদর্শও রণকৌশল সঠিকভাবেই সামনের দিকে এগুচ্ছে।

লেনিন,এই পটভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে,—১৯০৫-০৭ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানকে ব্যাখ্যা করে, তার তাৎপর্যকে নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করে, কয়েকটি পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করলেন,—যেমন, 'মস্কো অভ্যুত্থানের শিক্ষা,' 'বিপ্লবের শিক্ষা,' '১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব সম্বন্ধে রিপোর্ট' ইত্যাদি।

৬.

'সংগ্রাম করে পরাজিত কর উভয় দিকের—
ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের। ঠিক যে ভাবে
কমরেড লেনিন আমাদের শিখিয়েছিলেন।'

জে. স্তালিন

ভীষণ ঠাণ্ডা—চারদিকে কনকনে হাওয়া বইছে—১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের

জানুয়ারী মাসের এই রকম একটা দিনে, লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া জেনিভাতে এসে পৌঁছালেন। বলতে ভুলে গেছি যে, ফিনল্যাণ্ড থেকে জেনিভায় চলে আসার পথে স্টকহোমে তিনি ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে মিলিত হন। পিটার্সবুর্গে নিজে বসে থেকে স্ত্রী ক্রুপস্কায়া লেনিনের প্রবাস যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে এখানে এসে পৌঁছান। তিনি এলে পর দু-জনে মিলে জেনিভা যাত্রা করলেন। পথে আবার একবার বার্লিনে থেমে ছিলেন।

সে যাই হোক্, রাশিয়ার বিপ্লবী পরিস্থিতি ছেড়ে, সেখানকার কর্ম যজ্ঞের আয়োজন অসমাপ্ত রেখে, বাইরে কোথাও—বিশেষ করে শান্ত, জেনিভাতে বসবাস তাঁর মত কর্মীর পক্ষে—নেতার কাছে মোটেই আনন্দের বা খুশির ব্যাপার ছিলো না। লেনিন এই পরিবেশ এবং মানসিক অবস্থার বৈপরীত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, তিক্ত ভাষায় লিখেছিলেন যে: 'আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যেন এখানে কবরস্থ হতে এসেছি।'

ক্রুপস্কায়া এই অবস্থার কথা মনে করে লিখেছেন: 'গত বিপ্লবের পর আমাদের পক্ষে এভাবে পুনরায় দেশান্তরে কাটানো খুবই শক্ত ছিলো। ভ্লাদিমির সারা দিনটাই তার পড়াশুনায় কাটাতো। এবং আদৌ ভেবে পেতাম না, যে সন্ধ্যে বেলাটা আমরা কি ভাবে কাটাবো। নিরানন্দ, ছোট্ট এবং ঠাণ্ডা ঘরে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে মোটেই ভাল লাগতো না। বাধ্য হয়ে আমরা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে যেতাম। কিন্তু কোথাও আমরা শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে পারতাম না। অনুষ্ঠানের মধ্যিখানেই উঠে এসে আমরা রাস্তায় বা লেকের ধারে ঘুরে বেড়াতাম'।

এই ঝিমিয়ে পড়া—কিছু না করা অবস্থা, বেশীদিন থাকলো না। রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তা, জার স্বৈরাচারের উচ্ছেদ-আকাঙ্ক্ষা, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে আবার চাঙ্গা করে তুললো। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে বেশ বুঝতে পারলেন যে,

১৯০৫-এর অভ্যুত্থানের যে ব্যর্থতা তা সাময়িক—এই হেরে যাওয়াকে, দেশের সর্বহারা-বঞ্চিত সম্প্রদায় কিছুতেই বেশিদিন মেনে নেবে না, —আবার তারা শীঘ্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, এবং চিরস্থায়ী বিজয় অর্জন করবে। এই আত্মবিশ্বাসের ফলেই লেনিন ও তাঁর বলশেভিক পার্টি তাঁদের মনোবল হারিয়ে ফেলেন নি : হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি—তার প্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, রাশিয়া থেকে তাঁর চলে আসার পর, দু-মাস বন্ধ থেকেই পার্টি পত্রিকা 'প্রলেতারি'র পুনঃপ্রকাশ এবং বাশিযায তাব প্রচাবের ব্যবস্থাও করে ফেলা গেল [১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষে]।

আগেই বলেছি যে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের পবাজযেব পর, শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এলো প্রচণ্ড প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ। পার্টিকে ভেঙ্গে তছনছ কবে দেবার চেষ্টা হতে থাকলো অসংখ্য পার্টি কর্মীর জেল-নির্বাসন প্রাণদণ্ড পর্যন্তও হতে লাগলো। সক্রিয এবং অগ্রগামী পার্টি সভ্যদের আত্মবক্ষার্থে গোপন আশ্রয়ে চলে যেতে হলো। সাধাবণ সমর্থক, স্থানীয পার্টি সদস্যদের মধ্যে অনেকে পার্টিব কাজ-কর্ম ও বৈপ্লবিক সংযোগ ছিন্ন কবে ফেললো। সবচেয়ে বেশি ভাঙ্গন, মত পবিবর্তন ও বিশ্বাসঘাতকতা সুরু হলো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। প্রতিক্রিয়ার ও শাসকের স্বৈরাচারের দাপটে অনেকেরই প্রগতিশীলতার ও বিপ্লবীয়ানার মুখোস খুলে গেলো। মোটামুটি ভাবে, পার্টির ভেতরের এবং বাইরের অবস্থা ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলো : সর্বত্রই কেমন যেন নৈরাশ্যেব ছায়া নেমে এলো। এই ছায়া, প্রতিক্রিযাব এই কালো রঙ বাশিযার শিল্প এবং সাহিত্যের ওপরেও তার ছাপ ফেললো। গল্প, উপন্যাস, কাব্য-কবিতা ছবি-গান সমস্ততেই কেমন যেন এক ছন্নছাড়ার আভাস।

এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু লেনিন বিশ্বাস ও ধৈর্য হারিযে ফেললেন না। দৃঢ় মনোবল ও অনমনীয সাহস নিযে তিনি সমস্ত দুর্দৈবের

বিরুদ্ধে একাই যেন রুখে দাঁড়ালেন। তিনি পার্টি সভ্য, পার্টি দরদী, শ্রমিক ও কৃষকের অগ্রগামী অংশকে দৃপ্তভঙ্গীতে জানালেন ঃ '১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের আগের রুশীয় জনগণ, আর আজকের রুশবাসী, কোন-ক্রমেই এক নয়। সর্বহারার শক্তি তাদের শিখিয়েছে সংগ্রাম করতে। এবং এই সর্বহারারা সংগ্রাম করেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। এ ছাড়া, আপনারা তো সকলেই জানেন যে বিপ্লবের পথ ফুলে ঢাকা নয়—আমরা কাঁটা বিছানো সেই পথ দীর্ঘদিন ধরে হেঁটে চলেছি। আমাদের দৃঢ়তা বা শক্তি কোন পোষাক নয়—এ অন্তরের জিনিষ—রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। সেইজন্যেই আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বা সর্বহারার যে পার্টি তৈরী করেছি—তা পবাজয়ে ভেঙ্গে পড়ে না, প্রতি-আক্রমণে মাথা খারাপ করে না, এবং কোন হঠকারিতায় পিছলে যায় না। ....এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পার্টিই অবশেষে জয়ের লক্ষে পৌছোবে।'

এমনি অবস্থায় 'প্রলেতারি' আবার প্রকাশিত হতে থাকলো। গোপনে গিয়ে রাশিয়াতে পৌছাতেও লাগলো। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবার যেন এক ঝলক আলো এসে পড়লো। খণ্ড-বিচ্ছিন্ন পরিবেশ, নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার পরিস্থিতিতে এই পত্রিকা সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব, নতুন কর্তব্যে উদ্দীপিত কবার প্রেরণা নিযে হাজির হলো। এবং এব মধ্যে দিয়েই লেনিন পার্টির দ্বি-মুখী কর্মধারাকে গড়ে তোলার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এবারের এই পত্রিকায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অন্যতম গোর্কীকে সক্রিয় ভাবে ও আরো বেশি বেশি করে অংশ গ্রহণের জন্যে লেনিন আমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথমত, পার্টির যে অংশ—তাব শ্রমিক কৃষক সংগঠনের যে ভাগটা, অবৈধ হয়ে আছে—গোপনে কাজ করছে, তাদের কাজের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে হবে এবং কর্মক্ষমতাকে আরও বেশি করে জোরদার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পার্টি বা সংগঠনগুলির যে অংশ বৈধ—বা সামনা-সামনি কাজ করতে পারে, তাদেব কাজকর্মের

মাত্রা ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। নিপুণ রণজ্ঞ সেনাপতির মত—সমস্ত পার্টিকে শেখাতে লাগলেন কখন এগিয়ে যেতে হবে—কখন আপোষ করতে হবে—আবার প্রয়োজন মত কখন পেছিয়ে আসতে হবে। অবশ্য সমস্ত কিছুর মধ্যেই থাকবে সৈন্য-শৃঙ্খলা [military discipline]। তিনি আরও বললেন যে জারের কাছ থেকে ছোট ছোট যতটুকু বৈধ সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে তার সবটুকুরই সদ্ব্যবহার করতে হবে—তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাতে হবে। এবং এমন কি, গত ১৯০৫-এর অভ্যুত্থানের ধাক্কায় জার যে খোকা পার্লামেণ্ট [ডুমা] গড়ে তুলেছিল, সেখানেও প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেবার সুযোগ যেন অপব্যবহার করা না হয়। এই দু-দিক থেকে প্রস্তুতি গড়ে তোলার ফলে পার্টির রণকৌশল ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠলো।

বিপদের ওপর বিপদ,—গোদের ওপর বিষফোঁড়া। বাইরে জারের আক্রমণ—প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত তো সমানে চলেছে,—তার ওপর এসে জুটলো মেনশেভিকদের আপোষ-মূলক মনোভাব। গত বিপ্লবের পর জারের পিটুনির ঠেলায় মেনশেভিকদের বিপ্লবী-রঙ একেবারে ধুয়ে গেলো। তারা বিপ্লব করার সমস্ত বিশ্বাস নিলামে তুলে দিয়ে, সুবিধাবাদ এবং আপোষের তুলসীর মালা জপ করতে করতে লুপ্তপন্থী বা লিকুইডেটর পার্টিতে পরিণত হয়ে গেলো। তাদের এই বাবু বাবু, ভদ্র রাজনীতিতে কোন কোন শ্রমিক সংগঠন আকৃষ্টও হলো। লেনিন এদের সরাসরি পার্টির শত্রু বলে আক্রমণ করলেন। এবং 'আমাদের পুরাতন নিষিদ্ধ প্রলেতারীয় পার্টি থাকবে কি না'—এই জিজ্ঞাসা সামনে রেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করলেন।

এর মধ্যে আরও এক আপদ এসে জুটলো। বলশেভিকদের মধ্যে অনেকের—বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে—বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি নিয়ে দোলাচলচিত্ততা বা দোনামোনা ভাব দেখা দিলো। বোগদানভ, বাজারভ, লান্সার্কি প্রমুখ লেখকের নেতৃত্বে

অতিবিপ্লবী আগ্রহ সৃষ্টি করা হলো। তাঁরা—'গাছে না উঠেই এক কাঁদি'; 'না পাকতেই পেড়ে দে-না খাই'—গোছের কোরে, গরম বিপ্লবী বুলি ব্যবহার কোরে সমস্ত রকম বৈধ সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন। লেনিন এরও বিরোধিতা করলেন—তিনি এদের নাম দিলেন প্রত্যাহারপন্থী। কারণ এতে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ষোল আনা। তিনি আরও বেশি বিরক্ত হলেন এদের সংকলিত একটি গ্রন্থ 'মার্কসীয় দর্শন পাঠ প্রসঙ্গে' [১৯০৮] প্রকাশে।

লেনিন যেন চতুর্ভুজ হয়ে কাজ করতে লাগলেন। এক হাতে পার্টি-সংগঠন—অন্য হাতে নানা প্রবন্ধ-পুস্তিকা রচনা, এবং সর্বোপরি পত্রিকা প্রকাশ। এবং অপর দুই হাতে মেনশেভিক ও উগ্রপন্থী অর্থাৎ, লুপ্তপন্থী এবং প্রত্যহারপন্থী-দের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন।—তাদের অ-বিপ্লবী এবং প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে বুর্জোয়া সহযাত্রীত্বের স্বরূপ খুলে ধরতে থাকলেন।

অনেকদিন ধরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সহকর্মী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কী, ইটালির ক্যাপ্রি দ্বীপ থেকে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে লেনিন এপ্রিল মাসের শেষের দিকে [১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ] ক্যাপ্রিতে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। লেনিন এসেই বলশেভিকদের মধ্যে উগ্রতম অংশ, [যাদের কথা আগেই বলেছি] বোগদানভ প্রমুখের সঙ্গে লেনিনের বিরোধের মীমাংসা করিয়ে দেবার চেষ্টা থেকে যেন বিরত থাকেন—সে বিষয়ে গোর্কীকে অনুরোধ করলেন। এই সময়ে ওরা ক্যাপ্রিতেই ছিলো।

যাই হোক, রাজনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে দু-জনে নিজের নিজের জীবনের বিচিত্র কথার মধ্যে দিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে এলেন। গোর্কী তাঁর বাল্য-জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন, বন্ধু লেনিনের কাছে। লেনিন মুগ্ধ-বিস্ময়ে এই সাহিত্য-স্রষ্টার বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী শুনতে থাকলেন—মনে হলো তিনি যেন রূপকথা শুনছেন। সব শোনার পর লেনিন গোর্কীকে অনুরোধ করেন যে,

তিনিযেন এই কাহিনী লিখে ফেলেন। কিছুকাল পরে গোর্কী লেনিনের অনুরোধ রক্ষা করে তাঁর বিখ্যাত ত্রয়ী-উপন্যাস 'ছেলেবেলা', 'আমার শিক্ষানবিশী' এবং 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' [*Childhood, My Apprenticeship* এবং *My Universities*] রচনা করেন।

দু-জনে বন্ধুর মতো ক্যাপ্রির পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও অরণ্যাঞ্চলে বেড়িয়ে বেড়ালেন। তাঁরা এই প্রাচীন দেশের বহু বিখ্যাত স্থান ও দর্শনীয় জায়গা ভ্রমণ করে বেড়ালেন; যেমন, পম্পেই শহরের ধ্বংসাবশেষ বিসুবিয়স আগ্নেয়পর্বত, এই রকম সব। লেনিন সুযোগ পেলেই গোর্কীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্রি অঞ্চলের জেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতেন। তাদের জেলে-নৌকা করে দূর সমুদ্রে ঘুরে আসতেন। লেনিন জেলেদের সঙ্গে এই মেলামেশার সুযোগে তাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কেও নানা খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। তাঁর অনন্য মানবিকতা এবং গভীর সহানুভূতি দিয়ে তাদের হৃদযের রাজ্যটি কিনে নিয়ে ছিলেন। গোর্কী তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন: 'কত লোকই তো আসে—এই জেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, কিন্তু লেনিনের মত এমন করে, তাদের মনোযোগ কেড়ে নিতে কেউ পারে নি। বোধ হয় তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যে মানুষকে টেনে নেবার চৌম্বক শক্তি আছে'। এইখানেই লেনিন মহৎ—এইগুণেই তিনি একমাত্র এবং মহানায়ক।

দেখা-সাক্ষাৎ হলো। দু-জনেব মধ্যে নানা বিষয়ে অনেক রকম আলাপও হলো। এবং লেনিন ও গোর্কী একেবারে হৃদযেব কাছাকাছি চলে এলেন। গোর্কীর যে সমস্ত বিষয়ে বা জায়গায় সংশয় ছিল, তা তাঁর সঙ্গে আলোচনায় নিরসনও হয়ে গেল। লেনিনের কথা এবং মন্তব্য থেকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সত্যিকারের বড় সাহিত্যিক হতে হলে, দেশ-মাটি এবং মাটিব কাছাকাছি মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেই হবে। তিনি লেনিনের মধ্যেও এই গুণটিই দেখছিলেন। তিনি [লেনিন] রাশিয়া ছেড়ে এত দূরে চলে এসেও, দেশের মাটি আর মানুষের কাতর আহ্বান

শুনতে পাচ্ছেন। দেশের আকাশ-বাতাস-জনগণ তাঁর প্রাণে অবিরত প্রেরণার উৎসরণ ঘটাচ্ছে। লেনিনের, এই কদিন, তাঁর সঙ্গে বসবাস করার ফল নিজের জীবনে কেমন বা কতদূর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গোর্কী বলেছেন : 'তিনি ছিলেন একজন কড়া মাষ্টার-মশাই এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সদ্‌বন্ধু'।

গোর্কীর সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার কিছুকাল আগে বা পরে—'১৯০৫-০৭-এর প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচী' [*The Agrarian Programme of Social-Democracy in the First Russian Revolution, 1905-07*] নামে একটি বই প্রকাশিত হয় সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার-সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করে, তার সমস্ত কপি নষ্ট করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু এত চেষ্টা করে বইটিকে ধ্বংস করতে চাইলেও বইটির একটি কপি কোন ক্রমে বেঁচে গিয়েছিল—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত। তারও আবার একটা পাতা ছিল না। অবশ্য প্রায় দশ বছর পরে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সেটি লিখে দেন। জার বইটি নষ্ট করে ফেললে পর, পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিকদের অনুরোধে, লেনিন, তাদের পার্টি পত্রিকায় বইটির একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে দেন। সেটি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ছাপা হয়।

লেনিন এর আগে অনেকবার বলেছেন এবং বাস্তবেও তার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তুলতেই হবে। এবং তা বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই। এই বইটি সেই বক্তব্যেরই ফল। তিনি যে কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং কৃষি-সমস্যার প্রধান প্রধান কারণগুলিকে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন, তা এই বই পড়লেই বোঝা যাবে। 'প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে'—এই প্রবাদ লেনিনের ক্ষেত্রে যে কিরকম সত্য ছিল, তা বইখানার পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে

এই বইতে দেখালেন যে কৃষি-সমস্যার মূল কোথায় ? তিনি লিখলেন : 'এক কোটি কৃষকের হাতে আছে সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ ডেসিয়াটিন [১ ডেসিয়াটিন = ২৭ একর] জমি ; আর, মাত্র আটাশ হাজার জমি-দারের হাতে আছে ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ ডেসিয়াটিন জমি। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে আটাশ হাজার শোষক জমিদারের দখলে যে পরিমাণ জমি আছে, তা এক কোটি মেহনতি কৃষকের মালিকানাধীন জমির পরিমাণের চেয়ে সামান্য কিছু কম'। অতএব কৃষকের সমস্যা কোথায় ? কৃষকের বঞ্চনার ক্ষেত্র কোথায় ? তার ক্ষুধার কারণ কি ? তার ক্ষুধার কারণ জমিহীনতা। 'লাঙ্গল যার জমি তার'। 'কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে'। এই আওয়াজ তুলে তিনি কৃষককে সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এলেন। তিনি এর ভেতর দিয়ে দেখালেন যে তোমরা এবং শ্রমিকরা বঞ্চনা বা শোষণের ক্ষেত্রে এক—এবং অভিন্ন। এই কারণেই জার বইটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলো।

গোর্কীর কাছ থেকে ফিরে এসে লেনিন মেনশেভিক এবং উগ্রপন্থীদের উল্টোপাল্টা কথা বলার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। আগেই বলেছি যে তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেন না তিনি পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের তল্পী-বাহক। এবং একে মেনে নেওয়া মানেই বিপ্লবকে পরিহার করা। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের একজন মনোযোগী প্রচারক এবং নিষ্ঠাবান সমর্থক হিসেবে তিনি জীবন থাকতে কখনই সেটা মেনে নিতে পারেন না।

তাই ইংরেজী, রুশ, ফরাসী বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য বই-পুস্তিকা-পত্র-পত্রিকা পড়ে—প্রকৃতিবিদ্যা পদার্থবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সুপ্রচুর জ্ঞান লাভ করলেন—এবং বার বার করে মার্কস, এঙ্গেলস্ থেকে প্লেখানভ, মেরিঙ, ফয়েরবাখ ও অপরাপর অনেকের লেখা পড়ে ফেললেন। এই কাজের জন্যে, কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে,

লেনিনকে মাসখানেকের জন্যে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী ব্যবহার করতে যেতে হয়। তিনি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে যাত্রা করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঐ বছরের অক্টোবরে বইটির রচনা শেষ হলো। বইটির নাম দিলেন: 'বস্তুবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা: প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক মন্তব্য [*Materialism and Empirio-Criticism. Critical Comments on a Reactionary Philosophy.*]। সংক্ষেপে: 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' [*Materialism and Empirio-Criticism*]। বই তো লেখা হলো; কিন্তু আর এক সমস্যা দেখা দিলো, বইটিকে যে-কোরেই হোক জারের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে। তাই একে বৈধভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে; আবার ওদিকে তাড়াতাড়ি করেও প্রকাশ কবতে হবে। লেনিন তো রয়েছেন বিদেশে। এত সব করে কে? ঝক্কি-ঝামেলাই-বা এত পোহায় কে? অবশেষে, সব দায়িত্বই নিলেন বড় বোন আন্না ইলিনিচনা। এবং শেষে, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভ্লাদিমির ইলিন এই ছদ্মনামের স্বাক্ষরে বইটি 'জ্ভেনো' প্রকাশালয় থেকে প্রকাশিত হলো। ছাপা বইটি হাতে পেয়ে বড়দি আন্নাকে লেনিন লেখেন: 'বইটি পেয়েছি। ছাপার কাজ মন্দ নয়....মোটামুটি। বইটি যে আদৌ প্রকাশিত হযেছে, তাতেই আমি খুশি।'

এই বই অনেকের ওপর—অনেক দিক থেকে প্রভাব ফেলে। এখানে তিনি দর্শন এবং রাজনীতির মধ্যে গভীর মিলের কথা আলোচনা করলেন; এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক আচরণের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ যে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্য স্থাপিত করেছে—তাও তিনি এখানে আলোচনা করে দেখান। এই বইটির সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো—সব রকমের ভাববাদী বুর্জোয়া দর্শনের এবং সবরকম সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ সৃষ্টিতে।

আমরা আগাগোড়াই দেখে আসছি যে পার্টি'র জন্যে—তার ভাবাদর্শগত বিশুদ্ধতার জন্যে, লেনিনের সংগ্রাম ছিল ক্লান্তিহীন

এবং দুর্বার। এই বইয়ের মধ্যে সেই আপোষহীন দুরন্ত সংগ্রামের কথাই ফুটে উঠেছে। পার্টি'ই তাঁর কাছে ছিলো জীবন। তাই পার্টি কোনক্রমেই মার্কসবাদ এবং বিপ্লবী পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে যেতে না পারে, তার জন্যে তাঁর যে ক্ষমাহীন সংগ্রাম, তা এই বইয়ে একটা নতুন ব্যাখ্যা লাভ করেছিলো। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই বছরেরই মার্চ মাসে গোর্কীকে লেখা চিঠিটার কথা উল্লেখ করবো। সেখানে দেখা যাবে যে পার্টি এবং তার মতাদর্শগত বিশুদ্ধির জন্যে লেনিনের দৃষ্টি ছিলো কি তীক্ষ্ণ—এবং কত সতর্ক। তিনি লিখেছেন ঃ 'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন এবং বোঝা উচিতও কোনো পার্টি-সদস্য যখন এই বিশ্বাসে পৌঁছায় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রচার বিশেষ ভাবে ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর, তখন সে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হবেই।'

কেউ কেউ মনে করেন যে, 'বস্তুবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' গ্রন্থটি লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি অভিনব সংযোজন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে 'প্রলেতারি' পত্রিকার প্রকাশন-কেন্দ্র জেনিভা থেকে সরে এলো প্যারিসে। এই সময়ে প্যারিস ছিল রুশ রাজনৈতিক পলাতকদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং প্রলেতারি পত্রিকার কার্যালয় যখন সরে এলো, তখন স্বাভাবিক ভাবেই লেনিন ও ক্রুপস্কায়াকেও চলে আসতে হলো প্যারিসে। অবশ্য আরো একটা কারণ ছিলো এর পেছনে। তা হচ্ছে যে জেনিভার রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছিলো। এবং সেখানকার সরকারও যেমন রুশ রাজনৈতিক পলাতকদের আর আশ্রয় দিতে চাইছিলো না—তেমনি জেনিভার বাড়িওয়ালা এবং জমিদারেরাও রুশ বিপ্লবীদের আর বাড়ি ভাড়া বা আশ্রয় দিতেও রাজী হচ্ছিলো না।

প্যারিসে এসে কম ভাড়ায় এবং সুবিধেমত একটা ঘর জোগাড় করতে লেনিনকে খুবই বেগ পেতে হয়। শেষে ৪নং মারি রোজ স্ট্রিটে একটা দু-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট যোগাড় করতে সক্ষম হলেন তিনি।

[প্যারিসে লেনিনের এই বাড়ী সেখানকার জনসাধারণের চেষ্টায় বর্তমানে লেনিন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।]

শুধু লেনিনের নয়—প্যারিসে যত পলাতক রুশ বিপ্লবী ছিলো, সকলেরই খুব কষ্টে দিন কাটছিলো। বিরাট সংখ্যক এই বিপ্লবীদের অর্ধেক সময় খাওয়াই জুটতো না। পরণের পোশাক, বাসস্থান সব কিছুতেই চরম দীনতা ফুটে উঠেছিলো। লেনিন সাধ্যমত চেষ্টা করতেন তাদের সাহায্য করতে। লেনিন চেষ্টা করে একটা পারস্পরিক সাহায্য-ভাণ্ডার গড়ে তুললেন। তাতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। তিনি পারিশ্রমিক নিয়ে বক্তৃতা দিতেন, এবং সেই পয়সায় অভাবী কমরেডদের সাহায্য করতেন। যদি তিনি দেখতে পেতেন যে, স্বদেশের কোন পলাতক কমরেড অভাবে পড়েছে—দারিদ্র্যে কাতর হয়েছে তাহলে তিনি তার সাহায্যের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। যে কোন একটা কাজ জুটিয়েও দিতেন। প্যারিসে বাস করার সময়েও তাঁর কাজের চাপ ছিল অত্যধিক—পত্রিকা সম্পাদনা, প্রবন্ধ লেখা শ্রমিক-কৃষক বা অন্যান্য সভায় বক্তৃতা করা—তবুও তার মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের জন্যে যতখানি পারতেন—করতেন। মহান নেতৃত্বের পক্ষে এইভাবে তিলে তিলে দশের জন্যে—দেশের জন্যে আত্মদান, আমাদের সামনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রীতির একটি মূর্তি গোড়ে তোলে।

জেনিভার মত প্যারিসেও নানাধরণের লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতো। তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এখানেও আবার বলশেভিক কর্মীসঙ্ঘ গড়ে তোলেন। রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতো; সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের সঙ্গে যোগযোগ রাখার চেষ্টা করলেন। এছাড়াও এখানে তাঁরই উদ্যোগে সারা রাশিয়ার পার্টির একটা সম্মেলন বসে, —প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেয় বলশেভিকরা। এই সম্মেলন থেকেই লুপ্তপন্থী [লিকুইডেটর: অথবা শোধনবাদী] এবং প্রত্যাহারপন্থী [অৎজোভিস্টদের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং প্রবল

সংগ্রাম চালাবার ডাক দেওয়া হয়। এবং রাশিয়ার পার্টি সংগঠন-গুলির বলশেভিক অংশকে বিশেষ ভাবে তৈরী হতে আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলনের প্রধান রিপোর্টও পাঠ করেন লেনিন।

প্যারিসে আসার পর থেকে [১৯০৮-এর শেষে] প্রায় দু-বছর কাটলো প্রধানত প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিমার্কসবাদী—অথচ যারা মুখে গরম গরম বুলি আওড়ায়—তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। মোটামুটি ভাবে এই সময়টাকে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম—সংশোধন এবং মতাদর্শগত লড়ায়ের কাল বলা যায়। এই সময়েই বিখ্যাত লেনিন-ট্রট্স্কি বিরোধের সূচনা হয়। সুদৃঢ় বিপ্লবী পার্টি গঠনের প্রশ্নে ট্রট্স্কি একটা লেনিন বিরোধী গোষ্ঠী তৈরী করেন। তখন বাধ্য হয়েই এঁর বিরুদ্ধে লেনিনকে তীব্র সমালোচনার তরবারী শাণিত করতে হলো। ভণ্ড, কাজ গুছোনে, দু-মুখে নীতি ও কুৎসার প্রচারক হিসাবে লেনিন এঁকে চিহ্নিত করলেন এবং এঁর বিপ্লব-বিমুখী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত করে দিলেন।

আগেই বলেছি যে, প্যারিসে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে আসার পর থেকে, তাঁকে কেবলই প্রতিবিপ্লবী চক্রের বিরুদ্ধে—মতাদর্শের প্রশ্নে এবং কর্মপদ্ধতির বিষয়ে অনবরত আন্দোলন ও প্রচার চালাতে হয়েছে। অসংখ্য বক্তৃতা, প্রচুর রচনা—এবং বিভিন্ন আলোচনা চক্রে এদের স্বরূপ উন্মোচনের কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। যেমন, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে বেলজিয়ামে, পরের মাস নভেম্বরে রঁা দাত্নের বিজ্ঞান-পরিষদ্ [Science Society]-এ, ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্যারিসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে, এবং আরও অনেক—অনেক জায়গায় ও প্রসঙ্গে তিনি বক্তৃতা বা আলোচনা করেছিলেন। বিষয়, বক্তব্য এবং শেষ কথা হচ্ছে রাশিয়ার বিপ্লব, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য, জঙ্গী সংগ্রামক্ষম পার্টি এবং এর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই সব বক্তৃতা বা আলোচনার সময় কোন কোন জায়গায় লেনিনকে বাধাদান বা টিট্কারী দেবার চেষ্টাও করা হতো। কিন্তু

তাঁর বক্তৃতার নিরবচ্ছিন্ন গতি, তীর-তীব্র যুক্তি ও মনোরম বাচনভঙ্গী সেই সমস্ত শিয়ালের হুক্কাহুয়াকে ক্ষণেকের মধ্যেই থামিয়ে দিতো।

লেনিনের বক্তৃতা কেমন ছিলো! শ্রোতাদের ওপর তা কেমন প্রভাব বিস্তার করতো!—সে সম্পর্কে কোন এক সভার কোন একজন শ্রোতা যে মন্তব্য করেছেন তা প্রায় সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনার সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য :

তিনি বলেছেন : '....বিষযবস্তু এবং উপস্থাপন পদ্ধতি অভিনব। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে কেন লেনিন পার্টির ব্যাপক অংশের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং প্রীতি লাভ করেছেন। তিনি একজন সুচতুর প্রচারক, বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞ, গভীর তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ সমৃদ্ধ নেতা। তাঁর বক্তৃতা একাধারে শিক্ষিত শ্রোতা এবং সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারী ও বৃহৎ জনতা—সকলের কাছেই সমান আকর্ষণীয় ও মূল্যবান বলে মনে হতো। এক কথায় পার্টির—একজন প্রথম সারির নেতার মধ্যে যা কিছু বাঞ্ছনীয় তাঁর মধ্যে তা-ই ছিলো।'

একজন সরল সাধারণ শ্রোতার লেনিন সম্পর্কে এই সহৃদয় মন্তব্যের পর আর কোন কিছুই বলার থাকে না।—ছোট্ট একটি শিশির বিন্দুতে যেন বিরাট সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট ব্যুরোর এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এই সভাটি ছিলো ঐ ব্যুরোর একাদশ অধিবেশন। এখানেও তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলো সুবিধাবাদ। তিনি এই ব্যুরোরই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে আসবেন ঠিক হয়। অবশ্য এর কয়েকদিন আগে তিনি সপরিবারে বিস্কে উপসাগরের তীরে কিছুদিন ছুটি বা কাজ থেকে অবসর কাটিয়ে আসেন। এবং ফিরে এসে এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে মূলত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রসঙ্গেই আলোচনা করেন।

এই কংগ্রেসের আরও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—তা হচ্ছে এই যে, লেনিন ও প্লেখানভের—মতাদর্শের প্রশ্নে, আরও কাছাকাছি আসা। তাঁরা যৌথ ভাবেই জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত ট্রট্স্কির প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করেন। ট্রট্স্কি তাঁর ঐ লেখায়, 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির' ছিন্ন ভিন্ন এবং দ্বিধাদীর্ণ অবস্থার তাহা মিথ্যা ও জোলা যে ছবি আঁকেন, তাঁরা উভয়েই উপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে একযোগে তার ওপর তীব্র সমালোচনার জল ঢেলে দেন। এবং এই কংগ্রেসের শেষেই 'রাশিয়ায় আন্তঃ-পার্টি সংঘর্ষের ঐতিহাসিক অর্থ' [*The Historical Meaning of the Inner-Party Struggle*] নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা, করেন। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—লেনিন ও কোপেনহেগেনে এসে কংগ্রেসের রোজকার অধিবেশন বসবার আগে এবং পরে, নিয়মিত এখানকার সাধারণ পাঠাগারে পড়াশুনা করতেন। এবং সেই পড়াশুনার মূল লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা,—যা পরে নানাভাবে তাঁকে, তাঁর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছিলো।

এত কাজের মধ্যেও, নিজের জীবনের অসংখ্য অসুবিধা এবং কষ্টের ভিতরেও, জারের নির্যাতনের মাঝেও, নিজের পরিবারের জন্যে স্নেহ-ভালবাসার কোনো স্থানাভাব তাঁর হৃদয়ে হতো না। বিশাল সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যেও যেমন ছোট্ট ঝিনুকটি আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে; ঠিক তেমনি, লেনিনের 'একা মস্তকে সমগ্র ভূ-ভার ধারণ করিব' চিন্তার মাঝেও স্ত্রী-ভাই-বোন-মা এবং সব আপনজনের জন্যে প্রেম-প্রীতি-দরদ সংগ্রহ করে রাখতেন। বিশেষ করে মা।—মা মারিয়ার জন্যে তাঁর মনে বড় কোমলতা—অত্যন্ত ভালবাসা। আহা! মা আমার বড় অভাগিনী, বড় কষ্ট পেয়েছেন তিনি।

ভাবলে অবাক হতে হয়,—অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে

যিনি বজ্রের মত নির্মম, বিপ্লব আর পার্টির প্রশ্নে যিনি হিমালয়ের মত দৃঢ়, তিনিই আবার মা মারিয়ার কোলে,—স্নেহে-আদরে আজও তেমনি—বাছাটি। লেনিন আব তাঁর মায়ের এই স্নেহ-কোমল প্রসঙ্গ, আমাদের দেশের একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনিও এক প্রচণ্ড সমাজ-বিপ্লবী। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

লেনিন প্রায় তিন বছর মাকে দেখেন নি। অনেক দিন মায়ের সেই স্নেহ-কোমল হৃদয়ের ছোঁয়া পান নি। কঠিন কর্তব্য আর সংগ্রামেব মরুবালির মধ্যে ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেহ-মন সোহাগ আর ভালবাসার তৃষ্ণায় বড় কাতব হয়ে পড়েছে। তাই ছেলে চাইলেন মাকে দেখতে—আব মা চললেন ছেলেকে দেখা দিতে। বয়েস প্রায় পঁচাত্তর—তবুও সন্তানকে দেখতে—বিশ্ববিখ্যাত ছেলেকে কিছু স্নেহ-সোহাগ দিয়ে আবার শত শত গুণ উৎসাহিত করে তুলতে, বিদেশে চললেন। মা এলেন দেশ থেকে বিদেশে—স্টকহোমে। আর ছেলে গেলেন বিদেশ থেকে বিদেশে—কোপেনহেগেন থেকে স্টকহোমে। স্নেহোৎসধারার মাতৃ-মেঘপুঞ্জ এসে আশীষ চুম্বন দিলেন কর্তব্য ও আদর্শে অটল সন্তান-হিমালয়ের শিরে। মাকেই নিচু হয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিতে হয়। তাই বার্ধক্যের পীড়া সহ্য করেও তিনি স্টকহোমে এলেন। লেনিন তো রাশিয়ায় গিয়ে মাকে দেখে আসতে পারেন না—জারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা। তাই বিদেশেই দেখাশোনার ব্যবস্থা হলো।

যাই হোক, ক-দিন বেশ সুখে—হাসিতে-গল্পে আর কথাতেই কেটে গেল। আগের মতই, নিজেরা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সাধ্যমত তিনি মা-কে সেবা-যত্ন করলেন। মা খুশি, ছেলে উদ্বেল। এই সময় একদিন মারিয়া তাঁর ছেলের বক্তৃতা শোনেন। এই প্রথম তিনি জনসভায় লেলিনের প্রদত্ত ভাষণ শুনলেন। স্টকহোমের কমরেডরা মারিয়াকে বক্তৃতা শোনবার ব্যবস্থা করে দেন।

শেষে বিদায়ের দিন এসে গেলো। মা-কে বিদায় দিতে স্ট

মাকেও ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে হয়। লেনিন ফিরে যাওয়ার দিন মাকে জাহাজ-ঘাটা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। জাহাজে উঠতে পারেন নি—গ্রেপ্তার হবার ভয়। কারণ, এটা ছিলো একটা রুশ জাহাজ। তিনি জেটিতে দাঁড়িয়েই মাকে বিদায় জানালেন। বড় বিষণ্ণ সেই বিদায়-দৃশ্য। মা উঠে যাচ্ছেন সিঁড়ি বেয়ে, আস্তে আস্তে জাহাজের ওপরে—সত্যিই বড় বুড়ো হয়ে গেছেন মা। কতদিন পরে তো দেখা হলো। আর কি তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবে? কি জানি! ক্রুপস্কায়া লিখছেন: 'এটাই তাঁদের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকার, একথা লেনিন যেন বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বড় বিষাদ-মাখানো দৃষ্টি নিয়ে জাহাজটাকে দূরে—আরো দূরে—মিলিয়ে যেতে দেখলেন। বড় করুণ এই ক্ষণটি। সত্যিই তাঁদের মধ্যে আর দেখা হয়নি। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে লেনিন যখন দেশে ফেরেন, তার এক বছর আগেই মা মারিয়া চিরদিনের মত চলে গিয়েছেন।'

লেনিনগ্রাদের যে স্থানে লেনিন-জননী মারিয়া আলেক-জান্দ্রোভনাকে সমাধিস্থ করা হয়,—সেখানে রাশিয়ার কৃতজ্ঞ জনগণ একটি সুন্দর স্মারকস্তম্ভ তৈরী করে দিয়েছেন। এই মহীয়সী নারী তিল তিল করে আত্মোৎসর্গের দ্বারা যে মুক্তিপণ্য অর্জন করতে রুশ জনগণকে সহায়তা করেছেন, তার ঋণ কি দিয়ে শোধ হবে? তা যে শোধ হবার নয়। তবুও এই স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে দিয়েই স্মৃতি-সুধায় ভরা থাক রুশীয় জনগণের হৃদয়-পাত্র।

ঐ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে লেনিন আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। সামনে অনেক কাজ। অনেক দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার জমে রয়েছে। অবশ্য তিনি আশা করেন যে, —কোনো ভুয়ো আশা নয়—যে বিপ্লব আবার আসবেই এবং বিপ্লবের সেই প্রচণ্ড টাইফুনে অত্যাচার চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে। মেহনতি মানুষ সেই ধ্বংসের ওপরে আবার সুখ ও সমৃদ্ধির নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলবে।

অতএব চলো—পুনরায় নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কাজ! কাজ!! সামনে আরও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে!!!

৭.

'সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, আমাদের স্বার্থ আজ অগ্রসরমান।......আমাদের কাছে সামনের বস্তুগুলি আরও বেশি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।'

লেনিন

তাই কি কখনো হয়! অত্যাচার দিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগকে দমন করা যায়। না, যায় না। কংস-কারাতেই কংসহন্তা জন্মগ্রহণ করে। এটাই তো ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ।

এখানেও তাই হয়েছে। জার সরকার ভেবেছিলো যে জেল ফাঁসী, আর কঠোর নির্বাসনদণ্ড দিয়ে রুশ জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনাকে গুঁড়িয়ে দেবে—মেরে ফেলবে। তা পারা যায় নি—সেইখানেই তার সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেলো। পাঁচ বছর যেতে না যেতেই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন শ্রমিক শক্তিগুলি আবার একত্রিত হয়ে গতিবেগ অর্জন করতে লাগলো। চারদিকে নতুন বিপ্লবের ক্রোধ যেন রাগে গরগর করতে লাগলো—ঘা খাওয়া সিংহের মত। এখনই বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর যদিও দেশ থেকে অনেক দূরে—পিতৃভূমি থেকে বিদেশে রয়েছেন লেনিন—তবুও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা আর অনন্য দূরদৃষ্টি দিয়ে আগামী বিপ্লবের এই নতুন লক্ষণগুলিকে চিনতে ভুল করলেন না। অভিজ্ঞ নাবিক যেমন জলের কম্পন থেকেই বুঝতে পারে যে নদীতে জোয়ারের টান শুরু হয়েছে, লেনিনও তেমনি রাশিয়ার দু-একটা ঘটনা ও ধর্মঘট-এর ব্যাপার দেখেই বুঝলেন যে আবার জাগরণের পালা আরম্ভ হয়েছে—জন-গণেশের ঘুম ভাঙছে।

লেনিন এই ঘটনার সূচনাতেই উপলব্ধি করলেন যে জারের

প্রতিক্রিয়ার ফলে টুকরো টুকরো রাশিয়ায় প্রথমেই প্রয়োজন একটি দৃঢ়বদ্ধ জঙ্গী পার্টি; যে আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্ব দেবে। তাই তিনি অতিদ্রুত রাশিয়ার সমস্ত বলশেভিক শক্তিকে একত্রিত করতে আরম্ভ করলেন। এবং শ্রমিক-শ্রেণীকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

এর মধ্যে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে রাশিযার মহান সাহিত্যিক ঋষি লিও তলস্তয়ের মৃত্যু হয়েছে। এবং প্রায় একই সময়ে নানা দাবির ভিত্তিতে পিটাসবুর্গ মস্কো এবং আরো কয়েকটি শিল্পপ্রধান নগরীতে ধর্মঘট কৃষি বিক্ষোভ কর্মচারী এবং ছাত্র-জমায়েত শুরু হয়ে যায়। লেনিন বুঝলেন যে জনতাব মনোভাব পাল্টে যাচ্ছে;—অতি দ্রুত। এই সমস্ত জনসমাবেশ-ধর্মঘট-বিক্ষোভ থেকে নানা দাবী সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগলো—যেমন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মুক্তি দাও—প্রতিহিংসার অত্যাচার বন্ধ কর—আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাও—ইত্যাদি। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন অপরাপর দেশেব সোশ্যালিষ্ট পার্টিগুলিকেও প্রতিবাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুরোধ কবলেন। সেই অনুযাযী জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং আমেবিকা যুক্ত-রাষ্ট্রেও রুশ বিপ্লবীদের সমর্থনে নানা দিক থেকে প্রতিবাদ গড়ে উঠতে লাগলো।

রাশিয়ার মধ্যেকার এই অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়েও, পার্টির ভেতরের অবস্থা কিন্তু উত্তেজনায় তেমনিই কঠিন হয়ে রইলো। মেনশেভিক, ট্রট্স্কিপন্থী প্রভৃতি দলগুলি এমন অবিবেচনার সঙ্গে কাজ করতে লাগলো যে রুশ দেশের ভেতরেই, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অচল অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু লেনিন দূর থেকে হলেও সমস্ত অবস্থাটাকে গুছিয়ে তোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলেন। তিনি বলশেভিক-ঘেঁষা প্লেখানভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর একটা নতুন সংবাদপত্র 'শ্রমিকদের গেজেট' ['রোবচায়া গেজেটা' ঃ *Rabochaya Gazeta*] প্রকাশ করেন।

প্রথম বিপ্লবের পর থেকে জার যে অত্যাচার সুরু করেন,—তাতে মার্কসবাদীদের কাজকে যেমন গোপনীয়তা অবলম্বন করতে ['আণ্ডার গ্রাউণ্ডে'] হয়, তেমনিই সমস্ত আইন-সঙ্গত পত্রিকাগুলিও লুপ্ত হয়। লেনিন এই দ্বিতীয় বিষয়টিকে পুনরুজ্জীবিত করবার কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন। এবং নিজেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অসংখ্য বাধাবিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরে পিটার্সবুর্গ থেকে একটি নতুন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। এটির নাম দেওয়া হলো, 'ইজ্‌ভেদা' [বাঙলা উচ্চারণে 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'] *Zvezde* ঃ অর্থ ঃ 'তাবকা' [*The Star*]। এব প্রথম সংখ্যায লেনিন 'য়ুরোপে শ্রমিক আন্দোলনে মতভেদ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন এর সংখ্যাগুলিতে লেখা পাঠাবাব জন্যে তিনি গোর্কীকে অনুরোধ জানান। এবং যার ফলে 'ইটালির গল্প' [*Tales of Italy*] শিরোনাম-ভুক্ত হয়ে তাঁর সাতটি গল্প প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে লেনিন গোর্কীকে অনুরোধ জানান যে, 'আপনি যে আমাদের পত্রিকাকে সাহায্য করছেন—এর জন্যে আমি অত্যন্ত খুশি। এটিকে চালু রাখবার জন্যে আমাদের শয়তানের মত ভয়ঙ্কব পরিশ্রম করতে হচ্ছে —ভেতরে, বাইরে এবং পয়সায় আমাদের কঠিনতম বাধার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে,—কিন্তু তবুও এর মধ্যে থেকেই আমরা যে কোন প্রকারে ব্যবস্থা করে চলেছি।'

প্রায় এই সময়েই [ডিসেম্বরে] মস্কো থেকে বলশেভিকদের আর একটি বৈধ পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। এটির নাম দেওয়া হয় মিস্‌ল্‌ [*Mysl.* অর্থঃ ভাবনা (*Thought*)]। এটির দ্বারা এক দিকে যেমন আইনী লুপ্তপন্থীদের প্রতি আক্রমণ চালানো হতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি অগ্রগামী শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদে সুশিক্ষিত করে তোলা হতে লাগলো।

এই উভয় পত্রিকায় লেনিনের পঞ্চাশটিরও বেশী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেনিন সব সময়েই সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাঁদের ভুল-চুকগুলিকে সমালোচনা করতেন। ক্রমেই পত্রিকা দুটি

—বিশেষ করে প্রথমটি, মার্কসীয় মতবাদ প্রচারে এবং আন্দোলনের পক্ষে জঙ্গী হাতিয়ারে পরিণত হয়। এতে লেনিনের যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলির একটির নাম উল্লেখ আগেই করেছি। তা ছাড়াও 'মার্কসবাদের ঐতিহাসিক প্রাগ্রসরতা সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য' [*Certain Features of the Historical Development of Marxism'* : ইজ্ভেজদায় প্রকাশিত] এবং 'যারা আমাদের লুপ্ত করতো' [*Those Who Would Liquidate Us.* : মিস্‌ল্-এ প্রকাশিত] নামের কয়েকটি বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নদীতে জোয়ার আসছে—প্রচণ্ড দাবদাহের পর আষাঢ়ের নতুন বর্ষা-ধারায় পৃথিবী স্নিগ্ধ হতে চলেছে। বলশেভিকদের কাজে ও চিন্তায় বিশেষত্ব লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে নতুন নতুন কর্মী-সদস্য আসতে আরম্ভ করেছে। লেনিনের আনন্দ দেখে কে!—শরতে মাঠ ভরা সবুজ ধানের দিকে তাকিয়ে কৃষকের যেমন বুক আনন্দে-আহ্লাদে খুশিতে ভরে ওঠে, তেমনি নতুন আশায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু শুধু দল বাড়িয়ে, বা তা দিয়ে জনতার দল তৈরী করলেই চলবে না, তাদের নিয়ে সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী তৈরী করতে হবে। তাই তিনি পার্টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে নিয়মিত ক্লাশ নেওয়া হতে থাকলো। যারা এলো সেই সব ক্লাশে, তাদের মার্কসবাদ কি,—নতুন সমাজ গড়ার কাজে, বিপ্লব গঠনের কাজে কি ভাবে মার্কসবাদের শিক্ষাকে ব্যবহার করতে হবে?—ইত্যাদি বিষয় শেখানো হতে থাকলো। কোনো কোনো সময় বিপ্লবকালে অস্ত্রধরার কায়দাও তাদের শেখানো হতো। এই সব ক্লাশে, সাধারণতঃ বড় বড় পার্টি সংগঠনের গুপ্তশ্রমিক কর্মীরাও যোগ দিতেন। তারা শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তো —নিজেদের শিক্ষা আবার অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতো।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে এই পার্টি বিদ্যালয়ের সুরু হয় প্যারিসের কাছেই একটা ছোট গ্রাম লঁজুমোতে। প্রথমে ছাত্র হয় আঠার জন। তাঁরা এসেছিলেন কেউ পিটার্সবুর্গ, কেউ মস্কো,

কেউ বা সরমোভ, আবার কেউ কেউ বা বাকু, তিফলিস বা নিকোলায়েভ থেকে। এঁরা যখন প্রথম আসতে সুরু করলেন, লেনিনের তখনকার মনের অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে স্ত্রী ক্রুপস্কায়া বলেছেন: 'প্যারিসে যখন পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-শিক্ষার্থীদের প্রথম দলটি এসে পৌঁছালো তখন ভ্লাদিমিরের সে কি আনন্দ। তিনি সারা সন্ধ্যে বসে বসে তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতে থাকেন।'

আগেই বলেছি যে পার্টি স্কুলে নানা বিষয়েরই আলোচনা হতো। এর মধ্যে লেনিন অর্থশাস্ত্র নিয়ে উনতিরিশটি, কৃষি ও কৃষক সমস্যা নিয়ে বারটি, এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে বারোটি বক্তৃতা করেন। শ্রমিক-ছাত্রেরা অনেক সময় নিজেদের পছন্দমত বিষয়ও লেনিনের কাছে শুনতে চাইতো। তিনি তাঁদের সমস্ত প্রশ্ন ও কৌতূহলেব সরস-সরল ও বোধগম্য উত্তব দিতেন। গভীর-গম্ভীর তত্ত্বগুলিও স্বাভাবিক গল্প-গুজবেব মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা লেনিন করে দিতেন। এই স্কুলে পার্টি ক্লাশ প্রায় চার মাসের মত চলেছিলো।

ছোট্ট ঝর্ণাই বিশাল নদীতে পবিণত হয়। ঈশাণ কোণের এক টুকরো কালো মেঘ প্রচণ্ড কালবৈশাখীর সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র একটা বীজ থেকেই বিরাট মহীরুহ জন্মায়। তেমনি ছোট্ট একটা গ্রামে শুরু হওয়া মাত্র আঠারো জনের এতটুকু একটা মার্কসবাদী বিদ্যালয় [পাঠশালা বলাই ভালো], ভবিষ্যৎ বলশেভিক পার্টি স্কুল এবং কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিপুরুষ-রূপে চিহ্নিত হয়ে রইলো। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে ফরাসী কমিউনিস্টরা সশ্রদ্ধ চিত্তে লঁজ্যুমো স্কুল স্ট্রীটে এবং গ্রাঁ র‍্যু-র কোণের ৯১ নং বাড়ীতে একটা স্মারক-ফলক স্থাপিত করেছেন। তাতে লেখা আছে: '১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এখানে থাকতেন ভি. আই. লেনিন—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বকার, নেতা এবং সোভিয়েত য়ুনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা।'

এই বছরের গ্রীষ্মের শুরুতেই [মে, ১৯১১] লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে আবার সক্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কারণ, রাশিয়ার অভ্যন্তরের কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত বলশেভিক সদস্য জারের হাতে ধরা পড়ে গেছেন, তাই কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যই রাশিয়ার বাইরে রয়েছেন, তাঁদের নিয়েই লেনিন সম্মেলন বসালেন। এই সম্মেলন চলে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের ১০ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত—প্যারিসে। এটাই শেষ পর্যন্ত পার্টি কনফারেন্সে পরিণত হয় এবং এখান থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দেশের মধ্যেই একটি 'রুশীয় প্রস্তুতি কমিটি' তৈরী করতে হবে, যার কাজ হবে দেশের বিভিন্ন অংশে এখনই সক্রিয় বিপ্লবী কাজকর্ম গড়ে তোলা।

এর পর লেনিন ঠিক করলেন যে, এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোক প্রাগে—চেকোশ্লাভাকিযার বাজধানীতে। চেক কমরেডরা অনুষ্ঠান সফল করার জন্যে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। সম্মেলনের স্থান জোগাড করলেন,—নিজেদের শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করলেন,—তাঁদের নিরাপত্তা এবং যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যেব ব্যবস্থা করলেন। সৌহার্দ্য এবং বন্ধুত্বের স্পর্শে সমস্ত সম্মেলনটি প্রীতি-উষ্ণ হয়ে উঠলো। এবং যথার্থ ভাবে সর্বহারার আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে উঠলো।

এই সম্মেলনে ব্যাপক হারে শ্রমিকদেব প্রতিনিধিত্ব ঘটেছিলো। লেনিন পিটার্সবুর্গের ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানার একজন মিস্তিরিব সঙ্গে একটি চেক শ্রমিকের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। ঐ মিস্তিবির [নাম ঃ কমরেড ইয়ে. অনুফ্রিয়েভ] লেনিনের সঙ্গে সম্মেলন উপলক্ষে ক-দিন একসঙ্গে থাকাব যে স্মৃতি-চাবণ করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পাবলাম না। কারণ, এর মধ্যে দিয়ে মানুষ লেনিনের একটি অন্তরঙ্গ আর সরল ছবি ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য, বজ্র এবং কুসুম কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? আমরা এটা শুধু সাহিত্যিক উপমাতেই ব্যবহার করি—না, এর কোন বাস্তব ভিত্তি আছে? বোধ হয় একমাত্র লেনিনেই এর বাস্তব উদাহরণ।

রাজনীতির জটিল ও কূট-ভ্রূ-ভঙ্গীর সঙ্গে কি স্ফূর্তিবাজ—চটপটে-প্রাণোচ্ছল—সাদাসিধে—দিলখোলা ভাবের মিল হতে পারে? বোধ হয় পারে,—না পারলে 'লেনিন' হলো কি করে? কর্নেড অনুক্রিয়েভ লিখেছেন : "তিনি প্রায়ই অনেক রাত করে ঘরে ফিরতেন। কিন্তু যাতে কারুর ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তার জন্যে গোড়ালি টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেন। অত্যন্ত নিঃশব্দে জামাকাপড় পাল্টে বিছানায় শুতে যেতেন। যদি তিনি কোন দিন সকাল সকাল ফিরতেন তবে এসেই তিনি এক কাপ চা খেয়ে নিতেন এবং দশ পনেরো মিনিট বিশ্রাম করেই সারা ঘরটায় একটু হামাগুড়ি দিয়ে নিতেন [ব্যায়ামের মত করে]। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বলতেন, 'বেশ, স্টিপান, তুমি তোমার পড়া চালিয়ে যাও, আমি এখন একটু কাজ করবো'।"

বিদেশে—অন্যেরা অধিবেশনের তত্ত্বাবধান করলেও তিনি নিজে কিন্তু সকলের খোঁজ নিতেন—প্রত্যেকের পরিচয় জানার চেষ্টা করতেন—মন দিয়ে সবার, সব জায়গার অবস্থা শুনতেন। প্রয়োজন মত কাউকে উপদেশ দিতেন, কাউকে সংশোধন করে দিতেন, কাউকে বা উৎসাহিত করতেন। 'এইসব আলাপের সময় যদি তুমি লেনিনের কাছে থাকতে পাও, তবে তোমার নিশ্চয়ই মনে হতো যে তিনি রাশিয়ার সমস্তটাই ঘুরেছেন—দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্বের কোন অঞ্চলই তাঁর অজানা নয়। তিনি যেন প্রতিটি কারখানার ভেতরে ঢুকেছেন, প্রত্যেকটি কৃষকের কুঁড়েতে গিয়েছেন—এবং তাদের প্রত্যেকটি অবস্থার সঙ্গে এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠতম পরিচয় আছে।'

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র' ষষ্ঠ নিখিল-রুশ অধিবেশন প্রাগে সুরু হলো। এই অধিবেশনে মোট তেইশটি সভা হয়। এবং সবগুলিই হয় খুবই গোপনে। কারণ, প্রাগে রুশ পুলিশের কিছু চর সব সময়েই চারদিকে ঘোরাফেরা করতো।

লেনিন এই অধিবেশনের সমস্ত কার্যাবলীর তত্বাবধান করেন। তিনি এর চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন। প্রায় প্রত্যেকটি মুখ্য প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন, এবং সম্মেলনে পঠিত প্রস্তাবগুলির খসড়া তাঁকেই তৈরী করতে হয়। এক কথায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের তিনিই ছিলেন প্রাণ।

এখানে পার্টি তার নিজের শক্তি সমাবেশ করতে পেরেছিল বলেই, প্রাগের এই সম্মেলনকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দান করা হয়েছিলো। এর আগে যত সম্মেলন বা কংগ্রেস হয়েছে,—তাদের সমস্তটাতে লেনিন যে ভাবে পার্টির এবং তার সভ্য-কর্মীদের কর্তব্য এবং পথ-নির্দেশ করে এসেছেন এখানেও, আরও নতুন করে—আরও অগ্রসব চিন্তা নিয়ে, সব কিছুকে ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু এর সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে, নতুন ধরণের পার্টি নির্মাণে। বলা যেতে পারে 'রুশ-সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'কে একেবারে বলশেভিকদের পার্টি করে তৈরী করা হলো, এবং এ-বিষয়ে প্রাগ সম্মেলনের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো। তার জন্যে কেউ কেউ একে একটি পূর্ণাঙ্গ কংগ্রেসের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কারণ, এখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং পার্টির মতাদর্শের ও ভাবধারার বিরোধী সমস্ত প্রচেষ্টাকে নির্মম ভাবে প্রতিরোধ করা হবে। এরই ফল হিসেবে পার্টি থেকে মেনশেভিক—লিকুউডেটরদের বিতাড়িত করা হলো,—এদের সঙ্গে পার্টির কোন সংস্রব নেই বলে ঘোষণা করা হলো। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই, সমস্ত পার্টি সভ্যদের ওপরেই লুপ্তপন্থী [লিকুইডেটর]-দের কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হলো। অধিকন্তু, রাশিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত বে-আইনী পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর ও দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে নিযুক্ত হতেও প্রাগ সম্মেলন থেকে, কর্মীদের প্রতি ডাক এসেছিলো। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন ধরণের দালালদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যাপারেও পার্টি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

এই সম্মেলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে তৈরী করা। লেনিনকে নেতা করে গলোশ্চকিন, অর্জনিকেজে, স্তালিন প্রমুখকে কমিটিতে নির্বাচিত করা হলো। এই সব সভ্যদের মধ্যে যদি কেউ গ্রেপ্তার হয়ে পড়েন তবে সেই জায়গায় যাতে কাজ করতে পারেন, সে রকম কয়েকজনকেও 'গ্রহণ করা' [co-opted] হয়। যেমন, বুব্‌নভ, কালিনিন, স্তাসভা, পেত্রভস্কি এবং সেভ্‌র্দলভকেও পরে 'গ্রহণ করা' হয়েছিলো।

সম্মেলন শেষ হলে, লেনিন গোর্কীকে এক চিঠিতে সম্মেলনের বিষয়ে যা লেখেন, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন : 'আমরা শীঘ্রই আপনাকে সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ পাঠাচ্ছি। যাই হোক, আমরা লুপ্তপন্থী [লিকুউডেটর] বদমাইশগুলোকে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকেও পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আশা করি এ ব্যাপারে আমরা যেমন খুশি হয়েছি, আপনিও তদ্রূপ হবেন।'

একটা সুদূর প্রসারী এবং আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের সঙ্গে এবং খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে ধনিক শ্রেণীর দালাল, নকল-মেকী বিপ্লবী, বুলি-সর্বস্ব সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে, এই সম্মেলন শেষ হলো। লেনিনের নেতৃত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী সুচিরউড্ডীন হলো। আহ্বান এলো : 'পতাকা উড়ছে। সারা দেশের শ্রমিক সংঘগুলি সেই সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। এবং তা এবারে আর কোনো রকম প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না।'

এমন সময় হঠাৎ-ই—১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল, দূরে—সাই-বেরিয়ার তাগিযা অঞ্চলের 'লেনা স্বর্ণখনি'র নিরস্ত্র ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর জারের সৈন্যবাহিনী নির্মম ভাবে গুলি বর্ষণ করলো। বহু হতাহত হলো—খেটে-খাওয়া মানুষের রক্তে আবার রাশিয়ার মাটি ভিজে উঠলো। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের খবর বলশেভিকদের পত্রিকা ইজ্‌ভেস্তিয়ার মারফৎ সারা রাশিয়ায় দাবানলের মতো

ছড়িয়ে পড়লো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড়—ধর্মঘটের ঢেউ উঠলো। এমন একটি কণ্ঠ রইলো না, যে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে না উঠলো। প্যারিসে বসে লেনিন এই ঘটনা সম্বন্ধে পার্টির সভ্য ও সদস্যগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করলেন,—এবং কি ভাবে এই প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের প্রতিরোধ আন্দোলনে বলশেভিকরা নেতৃত্ব দিতে পারে সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

এই ঘটনার পর থেকেই, লেনিন লক্ষ্য করলেন যে পার্টির একটা নিজস্ব প্রেস থাকা একান্ত দরকার। কারণ, এখন ইজ্‌ভেস্তিয়ার এত চাহিদা বেড়ে গেছে যে সপ্তাহে তিনবার করে ছাপা হয়েও সে সাধারণের সংবাদ-পিপাসা মেটাতে পারছে না। এবং রাশিয়ার সব জায়গা থেকেই চিঠিপত্র এবং অনুরোধ আসতে লাগলো যে, একটা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা হোক,—আমরা সবরকমভাবে তাকে সাহায্য করবো। মোট কথা আমাদের নিজস্ব—আমাদের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে, একটা দৈনিক পত্রিকা চাই-ই চাই।

অতএব লেনিন আর চুপ করে বসে থাকতে চাইলেন না। জনগণের—কমরেডদের, আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণরূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ২৩শে এপ্রিল ডুমার [জার কর্তৃক গঠিত খোকা পার্লামেণ্ট] বলশেভিক সদস্য এন পোলেতায়েভ-এর নামে সরকারী ভাবে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি পাওয়া গেলো। এবং শেষে ৫ই মে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে শ্রমিক-শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র ‘প্রাভদা’ [*Pravda.* অর্থঃ সত্য (Truth)] প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় ঠিকানা দেওয়া ছিলো পিটার্সবুর্গ, কিন্তু আসলে নেপথ্য থেকে লেনিনের বাসস্থান প্যারিস-ই হলো এর প্রাণকেন্দ্র। লেনিন এবং স্তালিন যুগ্ম-ভাবে এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আজও এই পত্রিকা বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা নিয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এবং পৃথিবীর সংবাদপত্র জগতে এ একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পত্রিকাটির জন্মদিন

—৫ই মে। আজও ঐদিন 'প্রাভদা'র বাৎসরিক উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবকে বলা হয় 'শ্রমিকশ্রেণীর প্রেস দিবস'।

প্রাভদা হচ্ছে মার্কসীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ বিশ্বের প্রথম, শ্রমিকদের দৈনিক সংবাদপত্র। বুকের রক্ত দিয়ে—অনেক বাধা পার হয়ে, এই পত্রিকাটিকে শ্রমিকেরা বাঁচিয়ে এসেছে। তারা দফায় দফায় চাঁদা তুলেছে—জারের রোষের মুখে দাঁড়িয়েছে—তবুও পত্রিকাটিকে বন্ধ হতে দেয় নি। শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকা কিছুতেই এতদিন বেঁচে থাকতে পারতো না; কারণ, শুধু প্রথম বছরেই ৩৬ বার এর সম্পাদকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে—সাকুল্যে প্রায় চার বছর [৪৭'৫ মাস] এর সম্পাদকেরা জেল খেটেছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে এর ৪১টি সংখ্যা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এমন কি, জারের হিংস্র রোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই পত্রিকাটিকে বারে বারে নাম পাল্টাতে হয়েছে। যেমন, 'শ্রমিকের প্রাভদা', 'উত্তর প্রাভদা', প্রাভদার জন্য', প্রাভদার পথ' ইত্যাদি। এত করেও 'প্রাভদা' [সত্য] বেঁচে ছিল—বেঁচে আছে, এবং হয়তো আরও অনেক—অ-নে-ক কাল বেঁচে থাকবে। এমন কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় [১৯৩৯-৪৫], যখন হিটলারের নাৎসী বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে, তখনও এই পত্রিকার ওপর আঘাত হানবার চেষ্টা করা হয়েছিলো—কিন্তু রাশিয়ার দুর্দমনীয় ও লেনিনের অনুপ্রেরণায় মহাশক্তিমান জনগণ, অত্যাচারীর সেই হাত চিরদিনের মত গুঁড়িয়ে দিয়ে, তাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই পত্রিকা শুধুমাত্র যে শ্রমিক-মেহনতী মানুষের পরম আদরের ধন ছিলো তাই-ই নয়—এ ছিলো লেনিনের জীবন, হৃদয়ের হৃদয়। তিনি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে প্রাভদার প্রকাশের সূচনা কাল থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এতে কম করেও ২৮০টির বেশি প্রবন্ধ লেখেন। অবশ্য প্রায় কোনোটাই স্ব-নামে প্রকাশিত হতো না—ছদ্মনাম ব্যবহৃত হতো,—'ইলিন', 'ফ্রেই,' 'ত', 'সত্যবাদী', 'পাঠক', এই রকম আরও নানা রকমের।

যেমন অনেক ধরণের ছদ্মনাম, তেমনি নানা ধরণের বিষয়বস্তু ছিলো তাঁর লেখার। বিজ্ঞান—কারিগরী-বিদ্যা—সাহিত্য-সংস্কৃতি—নারী-সমাজ—শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কিছুকেই তিনি বাদ দিতেন না: সূর্যের আলোয় যেমন বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু উজ্জ্বল ও দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লেনিনের চিন্তাব আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সমস্যার অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে যেতো। ফলে, তিনি সহজেই সকলকে বোঝাতে পারতেন যে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা সাধারণত নিচের তলার শোষিত মানুষগুলির ঘুম ভাঙাতে, বুদ্ধির জাগরণ ঘটাতে খুবই ভয় পায়। তাই তারা যা কিছু পুরানো, খাবি খাচ্ছে, পচা-গলা তাকেই রঙচঙ করে জনসাধারণেব সামনে হাজিব করতে চায়—কোনো রকমে জীইয়ে রাখতে চায়, আর সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু তরুণ—তাজা—সবুজ তাকেই মেরে ফেলতে চায। একে তিনি 'সুসভ্য বর্বরতা' বলে সম্বোধন করে লিখলেন: 'কিন্তু ওরা যতই যাই করুক না কেন—সবুজের অভিযান যখন শুরু হযেছে—তখন তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।' এই পত্রিকার অনেক লেখায তিনি চীন-ভারত-এশিযা-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের সদ্য ঘুম ভাঙা নিপীড়িত মানুষগুলিকে, তাদের সংগ্রামকে সমর্থন কবেছিলেন।

লেনিনের আহ্বানে গোর্কীও 'প্রাভদা'য তাঁর লেখা পাঠাতেন। এবং সব কিছু মিলিয়ে তিনি প্রাভদার একটি চমৎকার ঐতিহ্য [যা আজও পর্যন্ত চলে আসছে] গড়ে তোলেন।

এই বছরেরই ২৩শে জুন লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া প্যারিস থেকে ক্রাকোতে চলে আসেন। এটি ছিলো পোল্যাণ্ড-এর একটি ছোট্ট গঞ্জ। পোল্যাণ্ডের এই অংশটি ছিলো সে সময় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেবীর রাজত্বের একটা অংশ। এই জায়গাটা রুশ সীমান্তেব খুবই কাছে। বিপ্লবী কাজকর্ম ও 'প্রাভদা'র আইনী-সম্পাদকীয় দপ্তর সেণ্ট পিটার্সবুর্গেরও খুব নিকটে; মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যেই পিটার্সবুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা চলে। লেনিন প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ [১৯১৪] আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এখানেই ছিলেন।

থাকবার জন্যে লেনিন প্যারিস থেকে যখন প্রথম এখানে এসে পৌঁছান, তখন এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। বসবাসের অনুমতি দেবার আগে পুলিশও তাঁকে তাঁর জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে। তিনি উত্তর দেন: "সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত গণতন্ত্রপন্থী 'প্রাভদা' নামে একটি রুশীয় পত্রিকাব সাংবাদিক আমি। প্যারিসের 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' নামে আরও একটি রুশ পত্রিকাতে আমি সংবাদ পাঠিয়ে থাকি। এবং এ থেকেই আমাব কিছু রোজগার হয়।" এরপর পুলিশ তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য কি, তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন: 'আমি এখানে এসেছি কৃষি-সম্পর্কে কিছু খবর সংগ্রহ করতে—এবং এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্যে আমার কিছু আন্তরিক আগ্রহ আছে। তা ছাড়া আমি পোলিশ ভাষাও কিছু শিখতে চাই।'

লেনিনেব এই উত্তরে ওখানকার পুলিশ কমিশনার তাঁর সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন: 'এই ভদ্রলোকেব এখানে বসবাস ও চলাফেরা সম্পর্কে আমি গোপনে অথচ কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দিলাম এবং সেই মত যথাযথ খবর জানাতেও বললাম।'

কিন্তু আসলে এখানে আসার আরও কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিলো দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, রাশিযায় ডুমায় যে চতুর্থ নির্বাচন হতে চলেছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও কর্মনির্দেশ পাঠানো। তিনি এ সম্বন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কীকে যে চিঠি লেখেন তার থেকে দেখা যাবে যে, উদ্দেশ্য ছাড়া লেনিন কোন কাজ করেন না—আর সে উদ্দেশ্য নিজের ব্যক্তিগত নয়—পার্টির, দেশের, সাধারণ মানুষের। তিনি লিখছেন: 'আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি কেন অষ্ট্রিয়ায় এলাম। কেন্দ্রীয় কমিটি এখানে একটা দফতর সংগঠিত করেছে [আমাদের নিজেদের মধ্যে]: সীমান্ত খুবই কাছে, আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি. এ জায়গাটা পিটার্সবুর্গের খুবই কাছে, সেখান থেকে তিন দিনের মাথায় কাগজ-পত্তর পেয়ে যাই, এখান থেকে

লেখা-পত্তরও ওখানে পাঠানো খুবই সহজ, ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ আগের থেকে অনেক ভালো চলছে। এখানে হৈ চৈও অনেক কম, যেটা একটা মস্ত বড় সুবিধে। আর অসুবিধে হলো যে, এখানে কোনো ভালো লাইব্রেরী নেই। বই ছাড়া দিন কাটানো বড়ই কষ্টকর'।

প্রথমে লেনিন রেল স্টেশন থেকে বেশ কিছু দূরে শহরতলী অঞ্চলে দু-খানা ঘব ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু পোস্ট-অফিস ও অন্যান্য বিষয়ে অসুবিধে হওয়ায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর রেল-স্টেশনের আরও কাছে ছোট্ট দু-খানা ঘরওয়ালা বাড়ীতে তিনি উঠে আসেন। 'এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে লেনিন আর ক্রুপস্কায়া অত্যন্ত সাধারণ ভাবে জীবন-যাপন করতেন। অল্পদামী একটা চেযার-টেবিল, দুটো লোহার খাট, বিনা বাহারের একটা জামা-কাপড় রাখবার আলমারি—ব্যাস্। আর সব ফাঁকা জায়গায় বই,—পত্র-পত্রিকা—কাগজ, মেঝে থেকে উঁচু পর্যন্ত টাল দিয়ে সাজানো।'

কিন্তু ঐ যে কথায় বলে, যার যা স্বভাব তা যাবে কোথায়। এখানে এসে আর সব কাজের মধ্যেও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে লেনিন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করতেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধা, তাদের রুজি-রোজগারেব উপায়, জীবন-ধারণেব পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক এবং অন্তরঙ্গ সংবাদাদি জোগাড় করতেন আমরা সব সময়েই লক্ষ্য করেছি যে, জনগণেব প্রতি লেনিনেব আচরণ বরাবরই ছিলো খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ। এই কারণেই, জনসাধারণও —যেখানেই তাদের সঙ্গে তিনি মিশেছেন—তাঁকে জানিয়েছে অন্তরের ভালোবাসা, বন্ধুত্ব।

এদিকে রাশিয়ায় ডুমার চতুর্থ নির্বাচন এগিয়ে এলো। লেনিন মত প্রকাশ করলেন যে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। কারণ,এতে স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের সঙ্গে পার্টি ও তার কর্মীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে, এবং পার্টির নানা ধরণের সংগঠনগুলিকেও চাঙ্গা করে তোলা সহজ হবে,

তার সাংগঠনিক দৃঢ়তা অনেকখানি নির্ভর করবে এই নির্বাচনের ওপর ; এই মত তিনি প্রকাশ করলেন। অবশ্য এখানে কেউ যেন ভুল না করেন, যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে লেনিন বুঝি পার্টিকে বিপ্লব থেকে সরে আসতে বলছেন ; বা তার বিপ্লবী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু না, মোটেই তা নয়। নির্বাচনে যোগ দিয়ে তিনি বোঝাতে চান যে—বিপ্লবের ক্ষেত্রে, তার আয়োজন ও সাফল্যের জন্যে কিছুই—সামান্যতম সুযোগও, ফেল্না নয়। সাগর বাঁধতে কাঠবেড়ালিটাও কাজে লেগেছিলো। আসলে লেনিন চেয়েছিলেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে। জার সম্রাট ডুমা তৈরীর মধ্যে দিযে যতটুকু সুযোগ দিযেছে, তাব মঞ্চ থেকেই যতখানি পারো তাকে আক্রমণ করো—তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করো। এই উদ্দেশ্যে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব নামে একটি নির্বাচনী কর্মসূচী তৈরী করলেন। এবং বলশেভিকরা সেই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে তিনটি প্রধান দাবী উপস্থিত করলো। দাবীগুলি হলো ঃ ক। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, খ। দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ, এবং গ। জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত। এই দাবীগুলিকে বলা হতো 'তিন মহাদাবী' [Three Great Demands]।

এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে। এতে বলশেভিকরা ছ-টি আসনে জয়লাভ করে [মেনশেভিকরা শিল্পাঞ্চলের বাইরের অংশ থেকে সাতটি আসন পায়] ; তথাপি লেনিন এই জয়লাভের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে কবলেন। কাবণ, এর সবগুলি আসনই এসেছে শ্রমিকরা বাস করে যে সব অঞ্চলে সেই জায়গা থেকে। অতএব তিনি দীর্ঘদিন ধরে যে নির্বাচনের অভিযান, কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বেশী বেশী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়ে, বলশেভিকদের বিপ্লবী মতের ও কাজের দিকে টেনে আনতে চাইছিলেন,—তা যথার্থ ভাবেই সার্থক হলো।

কিন্তু নির্বাচনের আসন লাভের মধ্যে দিয়েই কাজ শেষ হলো

বলে, লেনিন মনে করলেন না। তিনি দূর বিদেশ থেকেই—ডুমার বলশেভিকদের যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলো, তাদের কর্ম-নির্দেশ দিতেন। লেনিনের নির্দেশ মেনে ঐ সব প্রতিনিধিরা ডুমাকে বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক সমস্যা, বিপ্লবী বক্তব্য প্রভৃতিতেও লেনিন প্রতি-নিধিদের কাছে নির্দেশ পাঠাতেন। ডুমার অধিবেশনে তিনি [লেনিন] তাঁদের বজ্র-দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে বলতেন যে : 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হলো বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সর্বহারাদের একটি মহান অংশ। এই অংশ তার মহান শক্তি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ; এ অবশ্যই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করবে। হাজার হাজার সর্বহারা মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে তৈরী করবে একটি মহৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না—থাকবে না অত্যাচার, মানুষের দ্বারা মানুষকে আর শোষণ করা হবে না।'

আগেই দেখেছি যে, এই ডুমায় মেনশেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো মাত্র একজনের। কিন্তু সেই জোরেই তারা বলশেভিকদের প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল কাজ-কর্ম ও প্রস্তাবকে নাকচ করে দিতো। তাদের এই অন্তর্ঘাত, শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী কাজ-কর্মকে প্রকাশ করে দেওয়া হতো। ২৬শে নভেম্বর তারিখে জোসেফ স্তালিন 'শ্রমিক ডেপুটিদের প্রতি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দেশ' নামে একটি লেখা লেনিনের কাছে পাঠান। লেনিন তাকে অনুমোদন করে প্রাভদায় পাঠিয়ে দেন—যাতে পরবর্তী সংখ্যায় তা ছাপা যায়। এর কিছুদিন পরে লেনিন স্তালিনকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে চিঠি দেন [৬ই ডিসেম্বর]। তিনি তাতে করে স্তালিনকে জানান যে, তিনি [স্তালিন] যেন ডুমার বলশেভিক সদস্যদের এমন ভাবে নির্দেশ দিয়ে ও শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করেন, যাতে তারা ডুমার ভেতরে উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ভাবে লড়াই করতে পারেন।

এইভাবে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ শেষ হলো। একটা বছর, না একটা কালান্তর! যুগ-পরিবর্তনে অস্থির এবং নতুন উদ্যমে মহান—চঞ্চল।

লেনিনও এই বছরটিকে মহাকালের ঐতিহাসিক পাশফেরা বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পে এগিয়ে থাকা দেশগুলির চেয়ে রাশিয়ায় ধর্মঘট, বিক্ষোভ আন্দোলন অনেক বেশি দেখা গেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলও ফলেছে ভালো—বলশেভিক পার্টির আকার ও শক্তি দু-ই বেড়ে গেছে। পার্টির এবং জনগণের মধ্যে নতুন বিপ্লবী বিকাশ, একটা অগ্রণী স্তরে এসে পৌঁচেছে বলে এই বছরটাকে তিনি ফসল কুড়ানোর কাল বলেছেন। এবং সর্বোপরি এই হলো লেনিনের নেতৃত্বের বছর—যে নেতৃত্বে সর্বহারার পার্টি একটা নতুন ধরণের পার্লামেন্টেরিয়ান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলো।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারী পোল্যাণ্ডের ক্রাকোতে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র' কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন ডাকা হয়। উদ্দেশ্য গত বছরের প্রাগ সম্মেলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পার্টি'র কি অবস্থা হয়েছে,—শ্রমিক কৃষকের রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার হিসেব-নিকেশ নেওয়া। লেনিন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। এখানেও লেনিন আলোচনা ও বক্তৃতা সূত্রে বিশেষ ভাবে জোর দিলেন এই প্রশ্নে যে, গুপ্ত সংগঠনের ঐক্য এবং তাকে জোরদার করার জন্যে সমস্ত শ্রমিকদেরই ডাক দেওয়া খুবই জরুরী।

এই সময়ের মধ্যে 'জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য [*Thesis on the National Question*] এবং 'জাতি সকলের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার', 'মার্কসবাদেব তিনটি উৎস' [১৯শে এপ্রিল] ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ রচনা করেন। নানা ভাষাভাষী নানা আচার-আচরণে সমৃদ্ধ রাশিয়ার জাতি সমূহকে তাদের নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রশ্নে যেমন স্বাতন্ত্র্য দেবার কথা তিনি ঘোষণা করলেন, আবার তাদের একটি মাত্র সর্বহারার সংগঠনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে সংগ্রথিত কববারও ব্যবস্থা করলেন। পৃথক হয়েও, পূর্ণ

স্বাধীনতা ভোগ করেও,—এককেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে সবাই একতাবদ্ধ। হলেন। এ এক অপূর্ব পরীক্ষা—এবং আজও যে পরীক্ষায় কাজাক, উজবেক, রুশ বিভিন্ন জাতি পরিপূর্ণ স্বাধীন থেকেও একতাবদ্ধ। স্বভাবতই, এর সঙ্গে আমাদের ভারতের অবস্থা তুলনা করতে হয়, —কে কত কামড়া-কামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করতে পারে, তারই আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা এখানে আজও চলেছে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দও নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পোল্যাণ্ডের এই ক্ষুদ্র গঞ্জটিতে নিরিবিলি—অত্যন্ত ভালোভাবেই কাজ চালানো যাচ্ছে। এবারের কাজের জায়গাটা ভালই বাছা হয়েছে। এই সম্পর্কে এক চিঠিতে তিনি গোর্কীকে লেখেন: 'ক্রাকো-র এই আস্তানাটা সব দিক থেকেই খুব ভালো হয়েছে—অত্যন্ত উপকার দিয়েছে। কাজের দিক থেকে বিচার করলে আমার এখানে আসার দামটা পুরোপুরি উঠে এসেছে।'

বসন্তকালে স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়লো। কিছুতেই আর ভালো হচ্ছে না: লেনিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কি করা যায়। শেষে ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে নিয়ে তিনি পোরোনিন চলে আসেন [এটা মে মাসের প্রথম দিকের ঘটনা]। জ্যাকোপেনের কাছে পাহাড়ে ঘেরা এই মনোরম স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে এসে, এক কৃষক রমণীর কাছ থেকে ছোট দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে, কিছুদিন কাটালেন। এই জায়গাটা লেনিন এবং ক্রুপস্কায়ার খুবই ভালো লেগে যায়—তাই তাঁরা ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের গরমে আরও একবার এখানে এসেছিলেন।

কিন্তু এখানেও ক্রুপস্কায়ার শরীর বিশেষ ভালো হলো না,— আরো ভালো করে চিকিৎসার জন্যে তাঁকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বার্নে যেতে হয়। ডাক্তার দেখিয়ে তাঁরা জুলাই-এর শেষে পোরোনিনে আবার ফিরে এলেন।

শরৎকালের ৫ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পোরোনিনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাদের একটা সম্মেলন হয়। এখানে

সকলেই যেন এসেছিলেন বেড়াতে—ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে। এবং তাই এর কয়েকটা সভা বসে গুতা মোস্তয়ে হোটেলের বাড়ীতে—যেখানে ছদ্ম-ভ্রমণকারীরা আস্তানা গেড়েছিলো। এর কিছু সভা লেনিনের ঘরেও বসেছিলো। এই সম্মেলনও পরিচালনা করেন লেনিন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে এই অধিবেশন 'গ্রীষ্ম অধিবেশন' [Summer Conference] এবং পার্টির ইতিহাসে 'পোরোনিন অধিবেশন' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। কারণ, নিয়মিত পার্টিব কাজ-কর্ম পারিচালনা এবং তার নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছিলো।

এই অধিবেশনের শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির যে আবেদন প্রচার করা হয়, তাতে দেখতে পাওয়া যাবে, কি ভাবে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লেনিনের নেতৃত্বে ধীরে ধীবে সার্থকতাব পথে এগিয়ে চলেছেঃ ভগীরথ মানব মুক্তির ভোগোবতী ধারাকে কেমন করে আহ্বান করে নিয়ে আসছেন,—মহামানবের জীবন-সাগরে মিশিয়ে দেবার জন্যে।

ঐ অধিবেশনে পার্টি এই ভাবে আবেদন রাখলো ঃ 'রাস্তা ছকে ফেলা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টি তাব মূল কর্ম-পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছে। নতুন পরিস্থিতি এবং নতুন অবস্থার মধ্যে ফেলে পুরাতন বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যকে প্রামাণ্য করে নেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, সবচেয়ে কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছি। আমরা এক নতুন ক্রান্তিকালে প্রবেশ করতে চলেছি। পথে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অপেক্ষা করে আছে, এবং তারাই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। অতএব বন্ধুগণ, আপনাদের কাজ করে যেতে হবে।'

কিছুটা সুস্থ হলে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ অক্টোবর লেনিন ক্রুপস্কায়াকে নিয়ে আবার ক্রাকোর পুরাতন ডেরায় ফিরে এলেন। আস্তে আস্তে বছর শেষ হয়ে গেলো—অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে ১৯১৩ সালও বিদায় নিলো।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি রক্ত-রাঙা বছর।

মানুষের সভ্যতার এবং ঐতিহ্যের খাতায় সবচেয়ে 'কলঙ্কিত অধ্যায়। মানুষের হাতে মানুষের সংস্কৃতি ধ্বংসের বছর এটি।—প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনার বছর। এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে [গ্রীষ্মে] দুই লোভী মানবরূপী রাক্ষসের এই মরণ-যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। অবশ্য লেনিনের পক্ষে,—রুশ বিপ্লবের পক্ষে এই বিশ্বযুদ্ধ বিরাট সম্ভাবনা বয়ে এনেছিলো। যে বিষে মানুষের প্রাণনাশ হয়, সেই বিষ-ই উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারলে মৃত মানুষও সুস্থ হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনিই লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস ও হানাহানির অন্ধকারের মধ্যেই রুশ-বিপ্লবের নব-সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৮-৯ তারিখে লেনিন ক্রাকো থেকে বার্লিনে চলে আসেন। উদ্দেশ্য লেটিশ বলশেভিক পার্টি'র চতুর্থ কংগ্রেসের উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা। এখানে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই ব্রাসেলসে এই কংগ্রেসের উদ্বোধন হলো। একজন সম্মানিত অতিথি এবং কেন্দ্রীয় কমিটিব প্রতিনিধিরূপে লেনিন এই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ঠিক ছিলো যে,কংগ্রেসের উদ্বোধনের শুরুতে তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে গতবছরের মে মাসেই তৈরী করে বাখা একটা খসড়া কর্মপদ্ধতি হাজির করবেন।

এই কংগ্রেসে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এবং বে-আইনী ভাবে,—জাতীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে, সেখানে হাজির হয়েছিলেন। এখানে লেনিন জাতীয় সমস্যার বিষয়ে বলশেভিকদের মতবাদ এবং কৌশল-এর প্রশ্নগুলি আলোচনা করেন। তিনি লাতভিয়া এবং বাল্‌টিক অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে সুদৃঢ় এবং মতাদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ট্রট্স্কি-পন্থীদের বিভেদনীতি এবং প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের বিষয়েও মতামত প্রকাশ করেন ও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

প্রায় এরই কাছাকাছি সময়েই লেনিন 'একতার জন্যে চিৎকারের অন্তরালে ঐক্যের বিনাশ' [*Disruption of Unity Under Cover*

of Outcries for Unity] ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ট্রট্স্কির মধ্যপন্থা, তাঁর রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার মুখোশ খুলে ধরলেন। এই লেখাগুলোর আসল উদ্দেশ্য ছিলো, ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত তরুণ শ্রমিকেরা পার্টির এক বৃহত্তম অংশ অধিকার করেছিলো তাদের জানানো যে,—এ ঝগড়া কিসের জন্যে, কাদের বিরুদ্ধে এবং কেন? পার্টির ভেতরে সদ্য আসা তরুণদের মনে মতাদর্শগত এই লড়াই সম্পর্কে কোন দ্বিধা, কোন ভুল ধারণা যেন না থাকে। এইখানেই লেনিনের মার্কসবাদ প্রচারের বৈশিষ্ট্য। শুধু দাদাদের কথামৃত পান নয়,—বই-পত্র-পত্রিকা রয়েছে পড়ো, বোঝো এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে যাচাই করে নাও। কারণ, 'গুরু মেলে লাখে লাখ—চেলা মেলে লাখে এক।' অতএব যদি সত্যিকারের মার্কসবাদী হতে চাও, মার্কসবাদ দিয়েই মার্কসবাদকে বিচার করো। সেইজন্যেই এই সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করলেন লেনিন।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি লেনিন পোরোনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের এবং পার্টির রুশীয় কর্মকর্তাদের ফের একটা বৈঠক ডাকলেন। এখানে ডুমাব বলশেভিক প্রতিনিধিদের কার্য-প্রণালী আলোচিত হলো—এবং রাশিযায যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি প্রায় গড়ে উঠতে চলেছে, তার পটভূমিকাও বিশ্লেষণ করা হলো। কারণ, বাকুতে গত মে দিবসে যে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ হয়েছিলো, তা শেষে সাধারণ ধর্মঘটে পবিণত হয়।

এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। এই পোরোনিনের বৈঠক শেষ হবার ক'দিন পরেই [২০-২২ তারিখ নাগাদ] সেণ্ট পিটার্সবুর্গের গোয়েন্দা পুলিশ 'প্রাভদা'ব অফিসে হানা দেয় এর বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশ নানা ভাবে পত্রিকা অফিসের ক্ষতিও করে দিয়ে যায়।

পোরোনিনের সভা থেকেই পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসেব প্রস্তুতি নেবার উদ্যোগ আরম্ভ হলো। কিন্তু....। কিন্তু, সব কিছু কেমন যেন

গোলমাল হয়ে গেলো। সমস্ত ধ্যান-ধারণা, সভ্য মানুষের অভ্যস্ত হিসেব উল্টে-পাল্টে গেলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আচমকা ধাক্কায় সারা দুনিয়াটা যেন দুলে উঠলো। দুই লোভী দস্যু—মানব সভ্যতার হত্যাকারী দুই পাষণ্ড, তাদের ভাগ-বাঁটোয়ারার অ-বনিবনার রাগে পৃথিবীর নারী-শিশু-বৃদ্ধ সকলের ওপর মৃত্যুর বিষ ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা অগাস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলো।

৮.

'বিচ্ছিন্ন বা একা কোনো একজন শ্রমিক—অর্থাৎ কিছুই নয়। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-সংঘের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।'

লেনিন

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা অগাস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী দুই রাষ্ট্রের [Haves and Have nots] ভাগের গণ্ডগোল নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরি এবং তার বড় ভরসাদার জার্মানী, আর অন্য পক্ষে ছিলো ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া। পরে ধীরে ধীরে নিজের নিজের স্বার্থ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং আর আর দেশ, হয় এ পক্ষে—না হয় ও পক্ষে গিয়ে যোগ দিলো। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। এই মৃত্যু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। আর সবচেয়ে কষ্ট—সব চেয়ে দুঃখ নেমে এলো খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের ওপর: 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খগড়ার প্রাণ যায়।' এই সময় আরো এক মহাবিপদ হলো।

৭ই অগাস্ট লেনিন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়লেন। দেশে যুদ্ধের সময়কার সামরিক আইন চলছে....তাই সামরিক বিধি অনুযায়ী তাঁর বিচার এবং শাস্তি হবে। গুপ্তচর হিসেবে তাঁকে গুলি করেও মেরে ফেলা অসম্ভব নয়। কি করা যায়! মারাত্মক বিপদ

উপস্থিত লেনিনের জীবনের উপর। কিন্তু কি অপরাধ তাঁর। না....তাঁর ঘর তল্লাসী করে পরিসংখ্যান সম্বলিত কৃষি-সমস্যার ওপর একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। কি সর্বনাশ,....এগুলো শত্রুদের কাছে পাঠাবার কোন গুপ্ত চিঠি নয়তো। হতেও পারে। অতএব গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলো য়ুলিয়ানোভকে।

এখন উপায়! উপায় তারাই বার করলো....যাদের জন্যে লেনিন সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন....যাদের মুক্তি-স্বপ্ন তাঁর নিঃশ্বাস-বায়ু, সেই সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষই তাঁর পক্ষে লড়াই সুরু করলেন! সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়েও লেনিনের মুক্তির জন্যে অস্ট্রিয়ায় প্রগতিশীল সমাজ এবং সাধারণ কর্মীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে পড়ে এবং নিজেদের মিথ্যে অভিযোগের সামনে দাঁড়িয়ে, প্রায় দু-সপ্তা বাদে লেনিনকে অস্ট্রিয়ার সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হলো [১৯শে অগাস্ট]।

মুক্তি পেয়েই লেনিন মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে, পোরোনিন হয়ে ক্রাকোতে পৌঁছান। এখান থেকে লেনিন তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ইত্যাদি যা ছিলো নিয়ে, বাসা তুলে দিলেন। এবং নতুন ডেরা পাতার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করলেন [২৯শে আগস্ট]।

অস্ট্রিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগে লেনিনকে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি পাবার জন্যে তিনি রাজধানী ভিয়েনাতে ভিক্টর এ্যাডলার-এর সাহায্য নেন। ভিক্টর লেনিনের হয়ে এক মন্ত্রীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে গেলে উভয়ের মধ্যে এক মজাদার কথোপকথন হয়। সেটা এখানে উদ্ধৃত করা গেলো ঃ

মন্ত্রী ঃ আপনি কি ঠিকই জানেন যে য়ুলিয়ানোভ জারের একজন বড় শত্রু।

ভিক্টর ঃ ওঃ, সে আর বলতে। সত্যি কথা কি জানেন শত্রুতায় সে আপনার থেকে অনেক গুণ বেশি, আর অনেকখানি খাঁটি।

এইভাবে অনুমতি জুটলো। এবং লেনিন, তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ী

৫ই সেপ্টেম্বর সুইজারল্যাণ্ডে এসে পৌঁছালেন। প্রথমে তিনি এদেশের বার্নে কিছুদিন ছিলেন, পরে সেখান থেকে যান জুরিখে'। এই দু-জায়গাই তাঁর শেষ প্রবাস—শেষ আত্মগোপনের স্থান। এখান থেকেই তিনি ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছান এবং তার পরেই তো বিপ্লবের সাফল্য।

বেশ ভাল ভাবেই যুদ্ধ বেঁধেছে। এবং আগেই বলেছি যে আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রশক্তিই কোন না শিবিরে যোগ দিয়ে যুদ্ধটাকে বিশ্বযুদ্ধের আকার দিয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের সম্বন্ধে লেনিনের মনোভাব কি?

তিনি 'যুদ্ধ নিপাত যাক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' [Down with war! War against war!'] এই আওয়াজ তুলে পৃথিবীতে যারা যুদ্ধ বাধায় এবং যুদ্ধ চালিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা গড়ে তোলবার জন্যে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধে তাদের শুধু মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপকার নেই। কারুকে বা রণক্ষেত্রে—কারুকে বা তার বাইরে, অনাহারে-শীতে ও ব্যাধিতে।

বার্নে পৌঁছানোর পরেব দিন, অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর—সেখানে স্থানীয় বলশেভিকদের নিয়ে লেনিন একটা সভা কবলেন। এই সভায় তিনি যুদ্ধের ঘটনাটাকে সামনে রেখে তাঁর বিখ্যাত মতামত —'য়ুরোপীয় যুদ্ধে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কি কর্তব্য'—[*The Task of Revolutionary Social-Democracy in the European War'*] হাজির করেন।

এই মতামতের মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের লোভের ফল যে যুদ্ধ তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, পিতৃভূমির সম্মান—এ সমস্তই ছেঁদো কথা। এর কোন মূল্যই নেই। আসলে—পররাজ্য জয়, ব্যবসার উন্নতি এই সবই যুদ্ধের কারণ। এতে মেহনতী মানুষের কোনো লাভই নেই। যে দুই

বিরুদ্ধ দেশের সৈনিক এতে লড়াই করছে তারা দু-জনেই এক। কোথায়, কি বিষয়ে ? না, শোষণের ক্ষেত্রে—ধনীর দৌলত রচনার কাজে। অতএব এ যুদ্ধে এক সর্বহারা ভাই, আর এক সর্বহারা ভাই-এর বুকে ছুরি হানছে।

এবং এই প্রশ্নেই পশ্চিম-য়ুরোপের সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে [ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্মানী প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দ] লেনিনের তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়। তাঁরা বলতে থাকেন যে এখন যুদ্ধ বেধেছে,—অতএব এখন ওই সব শ্রমিক-কৃষকের ঐক্য, সমাজতন্ত্রের জন্যে, বিপ্লবের জন্যে লড়াই-এর আদে৷ দরকার নেই। এখন এই মহান যুদ্ধে যে কোন প্রকারেই হোক অংশ গ্রহণ করে পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভুলতে হবে,—এখন পিতৃভূমির পক্ষে বিশ্বযুদ্ধের মরণ-কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু ধ্বংস করতে হবে।

এই মতবাদের লোকদের লেনিন নাম দিলেন সোশ্যাল-শভিনিস্ট। [Social Chauvinist]। রাশিয়ায় প্লেখানভ, আলেকসিনস্কি, মাস্লভ এমন সব নেতাদের অনেকেই এই মতবাদের প্রচারক হলেন।

রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি জায়গায় এই সঙ্গে আরও নানা মতের অন্য লোক দেখা যায়। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যেমন সোশ্যাল-শভিনিস্টদের মত মানেন না—তেমনি আবার বিপ্লবী সোশ্যাল- ডেমোক্রাটিকদের কার্যাবলীও পছন্দ করেন না। এদের পরিচয় হলো মধ্যপন্থী বলে। নিজেদের এদিকেও নয়, ওদিকেও নেই বলে ঘোষণা করলেও—আসলে এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সোশ্যাল-শভিনিস্টদের, বুর্জোয়াদের সাহায্য করতো এবং শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের মধ্যেকার ঐক্যের পক্ষেও ক্ষতি করতো। সেদিন জার্মানীর কাউট্স্কি, ফ্রান্সের লঙ্গে এবং রাশিয়ার ট্রট্স্কি এই সব কাজ কর্মের নেতৃত্ব দিতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগামাত্রই এই রকম ভাবে দেশে দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মত ও পথকে অনুসরণ করে যারা চলছিল তাদের

অনেকেরই বিপ্লবীয়ানার লাল রঙ ধুয়ে যেতে লাগলো। সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক-স্বার্থের প্রয়োজনে তৈরী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক [Second Inter-National] ভেঙ্গে চুরমার হয়ে* গেল। সব যায়গাতেই সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক পার্টিগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তক্ষুণি তক্ষুণি আর কিছুতেই তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো গেল না।

খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এই অবস্থার মধ্যে লেনিন দাঁড়িয়ে। চারিদিকে শুধু শব দেহ—সৈনিকের, শ্রমিক সংগঠনের, সোশ্যালিস্ট পার্টির, বিপ্লবের, আর বোধ হয় মার্কসবাদী মতবাদেরও........

কিন্তু মার্কসবাদের মরণ তো হতে পারে না। সূর্য কি অস্ত যায়? না তো! আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টির বাহিরে সে চলে যায় মাত্র। এখানেও তাই! কাজ কিছু পেছিয়ে গেল। মার্কসের মতবাদের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী চিন্তাধারাটার পুনর্গঠনে লেনিনকে আরও কিছু সময় এবং আরও কিছু বেশি পরিশ্রম করতে হলো—এই মাত্র।

লেনিন এখন থেকে সুরু করে, রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভের ঠিক আগের সময়টুকু পর্যন্ত; অর্থাৎ—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রবেশের সময় পর্যন্ত,—অসংখ্য প্রবন্ধ-পুস্তিকা, বক্তৃতা-সভা-সম্মেলন এবং পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। উদ্দেশ্য সেই এক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সকলকে দাঁড় করানো, বিপ্লবকে এবং রাশিয়ার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া পার্টিকে সংগঠিত করা এবং মার্কসবাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পতাকাকে সব চেয়ে উঁচুতে তুলে ধরা।

এবং তার ফলেই কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তাহার রূপে ১লা নভেম্বর

* ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে পৃথিবীর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী হয়। একেই আন্তর্জাতিককে [International] বলা হয়ে থাকে।—লেখক।

'যুদ্ধ এবং রুশীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি' [*The War and Russian Social-Democracy*] লেখাটি প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহার ছাপা হলো এক বছর বন্ধ থাকার পর আবার প্রকাশিত [১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর] 'সোৎশিয়াল-ডেমোক্রাৎ' [Sotsial Democrat] পত্রিকার ৩৩শ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসেবে। এই পরিস্থিতিতে পত্রিকাটির পুনঃপ্রকাশ সব দিক থেকেই ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধের সময় কাজ করা যদিও খুবই কষ্টকর ছিলো তবুও লেনিন এক মুহূর্তের জন্যেও পার্টির কাজ ছাড়েন নি। বার্ণ, জুরিখ, জেনেভা সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা শহর থেকে তিনি পার্টির কর্মপন্থা এবং বিপ্লবী তৎপরতা সম্বন্ধে সমানে রিপোর্টিং-এর মত করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধাপরাধ এবং রাজনীতির নাম করে সুবিধাবাদকে তিনি তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেন। বিশেষ করে মধ্যপন্থী কাউট্স্কি, ট্রট্স্কি প্রমুখদের তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। লেনিন লেখেন: 'আমি ঘৃণা করি, সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করি কাউট্স্কিকে। কারণ, তার প্রচারিত সুবিধাবাদ সবচেয়ে বেশি দুঃখ ও অনিষ্ট টেনে নিয়ে আসছে। তার মধ্যপন্থা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছে এই কারণে যে, একে প্রগতিবাদের ছদ্মবেশ পরিয়ে বেশ চালাকি করে হাজির করা হচ্ছে। এই জন্যেই তা শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিবেককে সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অতএব এ-সবই সংগ্রামের পক্ষে মহা-অমঙ্গলজনক।'

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেবরুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ বার্ণে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র বৈদেশিক বিভাগের সদস্যদের দ্বারা। এখানেও লেনিন সভাপতিত্ব করেন। এই বছরেরই ২৩শে অগাষ্ট 'য়ুরোপের যুক্তরাষ্ট্র ধ্বনি' [*On the Slogan for a United States of Europe*] প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর 'সর্বহারার বিপ্লবের রণনৈতিক কর্মসূচী' [*The Military Programme of the Proletarian Revolution*] নামক

প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়। এ-সব লেখাগুলিই ছিল ট্রট্স্কি বা প্লেখানভ ইত্যাদির প্রতি-বিপ্লবী এবং শ্রমিক বিরোধী মধ্যপন্থা বা সুবিধাবাদের সমালোচনা।

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সুইজারল্যাণ্ডের একটি গ্রাম জিমারওয়াল্ডে 'প্রথম আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট সম্মেলন' [The First International Socialist Conference]। এই সম্মেলন সেপ্টেম্বর মাসের ৫ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত চলেছিলো। প্রতিনিধি এলেন এগারটা দেশ থেকে মোট আটত্রিশ জন। সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার দু-দিন আগে লেনিন এখানে এসে পৌঁছালেন। পৌঁছেই রুশ এবং পোলিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে, আগামী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে, বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এই সম্মেলনেও তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলো সোশ্যাল-শভিনিজমের ভুল ও সুবিধাবাদী বক্তব্যগুলো। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এখানেও মতাদর্শগত তীব্র লড়াই চলে। একদিকে লেনিন এবং অন্যদিকে কাউট্স্কির মতাদর্শের লোকেরা,—শেষের এই মতের নেতৃত্ব করছিলো জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধি লেডেবার এবং এরাই সম্মেলনের মধ্যে একটা দক্ষিণপন্থী আবহাওয়ারও সৃষ্টি করলো।

শেষে লেনিনের পক্ষে,—বামপন্থীদের কাছ থেকে, সম্মেলনের সামনে, যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কি কর্তব্য এ বিষয়ে একটা খসড়া প্রস্তাব এলো। কিন্তু যারা বিপ্লব চায় না,—সুবিধাবাদের আরামে অবসন্ন সেই দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তবুও লেনিন এবং আরও বেশকিছু বামপন্থী প্রতিনিধিদের প্রবল চাপে পড়ে, কিছু পরিবর্তন করে মার্কসবাদের মূল বিপ্লবী তত্ত্বকে ইস্তাহারে গ্রহণ করা হয়। এই ইস্তাহারের সব শেষে মন্তব্য করা হলো এই বলে: 'বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও এমন মহান ও জরুরী কর্তব্য দেখা দেয় নি, এবং সে কর্তব্য নিষ্পন্ন করাই আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে পৌঁছাতে, কোন আত্মত্যাগই ততবড় নয়, কোন দায়িত্ব ভারই তেমন গুরু নয়।

'শ্রমজীবী নরনারিগণ! পিতামাতাগণ! বিধবা এবং অনাথেরা। আহত এবং রুগ্ন ভাইয়েরা। যাঁরা যুদ্ধ করছেন এবং যাঁরা যুদ্ধ চলার জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন; যাঁদের যুদ্ধ সীমান্ত অথবা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্র, কিংবা বিধ্বস্ত গ্রাম-শহর অতিক্রম করতে হচ্ছে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে সমানভাবে আমরা আবেদন জানাইঃ দুনিয়ার মজদুর, এক হও।'

লেনিনের এই আহ্বান তীর-তীব্র গতিতে, অন্ততঃ রুশদেশের গ্রামে-প্রান্তরে-গঞ্জে-শহরে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জেগে উঠলো—নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোচ্চার হলো। লেনিন জিমারওয়াল্ডের এই অধিবেশনকে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন; রাত শেষের একটি মাত্র পাখীর কলকণ্ঠে পৃথিবীতে দিনের সংবাদ এসে পৌঁছানোর মত। এখান থেকেই লেনিন বলশেভিকদের জানালেন যে আমাদের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন—কঠোর। কারণ, সুবিধাবাদ এবং তার সাফাইদারদের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। তাঁর কথায়ঃ 'এই আন্তর্জাতিক দায়িত্বটা পড়েছে আমাদেরই ওপর। আর কেউ-ই নেই সঙ্গে। তাই এটাকে এড়িয়ে যাওয়া কোন মতেই চলে না।'

অত্যন্ত পরিশ্রম হচ্ছিলো। নানা বিপরীত অবস্থার সঙ্গে যুঝতে এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে—দৈহিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীরের প্রতি খুবই অত্যাচার হচ্ছিলো। তাই তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাইলেন। পাহাড়ের মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিয়ে, আবার নতুন উদ্যমে—নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরের প্রথম দিকে, তিনি আর ক্রুপস্কায়া [illegible]র বার্ণে ফিরে এলেন।

ফিরে তো এলেন। কিন্তু ওদিকে যে আর চলে না। যাই করো বাপু—পেটে তো দু-টি কিছু দিতে হয—লজ্জা নিবারণেরও কিছু ব্যবস্থা করা দরকাব। এই দুটোব ব্যবস্থা, এত দিন, কি দেশে আর কি বিদেশে, যা হোক কবে চলে এসেছে। কিন্তু এ ভাবে তো আব চলছে না। লেনিন তো আর চাকবী করেন না—বা পৈত্রিক জমিদারীও নেই। তা ছাড়া তিনি এখন বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরূপে বযেছেন। এর মধ্যে আবাব বোঝার ওপর শাকেব আঁটি—যুদ্ধ লেগেছে। ফলে চারদিকে সব জিনিষেব দামও অত্যন্ত চড়া। অতএব তিনি ভযানক কষ্টে পড়লেন। এতদিন যে খুব কিছু একটা পঞ্চব্যঞ্জন জুটছিলো তাও নয—তবে যা হোক সাত পাঁচ কবে—ঘটিব জল বাটিতে ঢেলে, বুদ্ধিমতী ক্রুপস্কাযা চালিযে নিচ্ছিলেন। কিন্তু এখন যে আব চলে না আমরা জানি, ববাববই দেখে এসেছি যে, লেনিন খুবই সাধাসিধে থাকতেন—কোন বাড়তি বিলাস-বাহুল্য তাঁব ছিলো না কিন্তু তাও আর সম্ভব হচ্ছে না। ক্রুপস্কাযা তাঁব ননদ মাবিযা ইলিনিচনা য়ুলিযানোভাকে একটা চিঠিতে এই সমযে [ডিসেম্বর, ১৯১৫] লেখেন: 'আমাদেব যা কিছু সম্বল ছিলো তার সবই বোধ হয এবাবে শেষ হলো।'

সত্যিই তো কলসিব জল গডাতে গড়াতেই শেষ। এই সমযকার সংসাব চালানোর অপবিসীম কষ্টেব কথা লেনিনেব একটা চিঠিতে বড় করুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। আমবা এখানে তাব উল্লেখ কবে দেখাবো যে কত দীন অবস্থায বিশ্বেব কোটি কোটি মানুষেব মুক্তিদাতার দিন কেটেছে। আগুনে পুড়েই সোনা খাঁটি হয—দুঃখ দারিদ্র্যের আগুনে এই ভাবে পুড়েই বোধহয লেনিন ইস্পাত কাঠিন্য ও অনমনীয দৃঢ়তা লাভ করেছিলেন। তিনি লিখছেন: 'এবার কিছু নিজেব কথা বলতে হয। আমাব কিছু রোজগাব দরকার। নইলে সব কিছুই যাবে—সত্যিসত্যিই। সব জিনিষেরই দাম যাচ্ছেতাই বকমেব চড়া এবং আমাদেব দিন গুজরানের মত কোন রেস্ত-ই নেই; তোমবা ভাই [illegible] কবে আমার বই-এর প্রকাশকদের

কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে দাও। এবং এটা দিতেই হবে। আর যদি এবিষয়ে কিছু ব্যবস্থা-পত্তর না করো, তবে ঠিক বলছি যে আমি আর দিন চালাতে পারবো না। জানবে যে এটা অত্যন্ত রূপে জরুরী,—একান্তভাবে—অত্যন্ত রূপে।'

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি আবারও একটি পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় করছেন। পত্রিকাটি হবে জার্মান ভাষায়। নাম 'হেরল্ড' [*Herald* ঃ জার্মানীতে *Vorbote*]। এখানে তাঁর একটি বিখ্যাত লেখা প্রকাশিত হয়। নাম 'সুবিধাবাদ এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যু' [*Opportunism and the Collapse of the Second International*]। এখানে তাঁর লেখা একটা 'থিসিস'ও প্রকাশিত হয়ঃ 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' [*The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination'*]।

কিছুদিন পরেই তিনি বার্ণ থেকে বাসা গুটিয়ে জার্মানীর জুরিখে স-পরিবারে চলে আসেন [ফেব্রুয়ারীর ১০ অথবা ১১]। এখানে একটা সরু গলির পুরানো একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে, একটা মাত্র ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি ছিলেন। বাড়ীটা ছিল কাম্মারের নামে একজন জুতো প্রস্তুতকারকের। এই বাড়ীতে অনেক কিছুই ছিলো, শুধু জায়গা ছাড়া।

উঠোনের মধ্যিখানে সসেজ তৈরীর একটা কারখানা ছিলো—যার গন্ধের চোটে সন্ধ্যের আগে আর ঘরের জানলা খোলার উপায় ছিলো না। অথচ এই ভাড়াতেই যে এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু তবুও লেনিন এই বাড়ীটা ছাড়তে চাইতেন না। এছাড়া বাড়ীটা ছিল সর্ব দেশ ও জাতির ছোট্ট একটি মিলন স্থল। যেমন, বাড়ীটার দুটো ঘর ছিলো বাড়ীওয়ালা ঐ জুতা প্রস্তুত-কারকের দখলে; একটা ঘরে একজন জার্মান সৈনিকের বউ তাঁর ছেলে-পুলেদের নিয়ে থাকতেন, অপর আর একটাতে একজন ইতালীয় ভদ্রলোক থাকতেন, আর একটা ঘরে একজন অস্ট্রিয়ান অভিনেতা

আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং চতুর্থটিতে লেনিন ও ক্রুপস্কায়া থাকতেন। এরকম মজাদার ও নানা ধরণের মানুষের আস্তানা যে বাড়ী তা ছেড়ে লেনিন যেতে চাইবেন না সে তো জানা কথাই। এর ওপর একদিন ঐ বাড়ীওয়ালার স্ত্রী শ্রীমতী কাম্মারের যা বললেন, তা শুনে লেনিনের তো চক্ষু স্থির। শ্রীমতী একদিন রান্নার কাজ করতে করতে, হঠাৎ কি একটা প্রসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন : 'সৈনিকদের উচিত তাদের বন্দুকগুলো তাদেরই সবকারেব বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরা।' একথা শুনে লেনিন ঠিক করে ফেললেন যে ওবাড়ী থেকে আর এক পা কোথাও নড়বেন না।

লেনিন এখানেই বিপ্লবেব পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত,—সেন্ট পিটার্সবুর্গ ত্যাগের আগে পর্যন্ত,—রয়ে গিয়েছিলেন [২রা এপ্রিল, ১৯১৭]। জুরিখের পৌরসভা লেনিনেব এই অবস্থান-কালকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তর ফলক গেঁথে দিয়েছেন। লেনিন যে ঘরে থাকতেন তার জানলার নিচে গাঁথা ঐ স্মৃতিফলকে লেখা আছে : 'লেনিন, রুশ বিপ্লবের নেতা এখানে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেবরুয়ারী থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল পর্যন্ত বাস করেছিলেন।'

এ বছরেরই গ্রীষ্মকালে প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণানুসন্ধী গবেষক এবং অনন্য বিপ্লবীর যে মহত্তম কীর্তিটি আত্মপ্রকাশ করলো—তা হচ্ছে, 'সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর' [*Imperialism the Highest Stage of Ccpitalism*] গ্রন্থটির প্রকাশ। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের একেবারে গোড়াতেই এই বই-এর রচনা-কাজ আরম্ভ হয়। অবশ্য অনেক আগে থেকেই এই বই বচনাব প্রস্তুতি চলছিলো—অনেক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কাজ ও লেখার মধ্যে দিয়ে। সবার চোখের আড়ালে যেমন ভাবে জল-সঞ্চার হয়—দৃষ্টির আড়ালে যেমন কুঁড়ি ফুল হয়ে যায়—তেমনিই এই বইটি তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ধীর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

এই রকম একটা তাৎপর্য পূর্ণ বই সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই কিছু

জেনে নেওয়া উচিত। তা-ছাড়া এই বইতে লেনিনের বক্তব্য যে কত নির্ভুল এবং সত্যি ছিলো তা প্রমাণ হতে মাত্র এক বছরের একটু বেশি সময় লেগেছে। নানা পরিসংখ্যান—তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি কিছুটা নিরস বিষয়বস্তু-সম্পন্ন হলেও এতে লেনিন কি বলতে চেয়েছেন তার অ-আ-ক-খ-টুকুকে জেনে নিতে আমাদের কিছু চেষ্টা করতেই হবে;—গ্রীষ্মের সূর্য যত প্রখরই হোক না কেন,—তাকে বাদ দিয়ে তো আর জীবন চলে না।

এই বইতে লেনিন আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়া ধরে টান মারলেন। পৃথিবীর ঘি-দুধ-ননী-ছানাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাম্রাজ্যবাদী-ধনকুবের দখল করে নিতে চায়। আর যখনই এই ভোগে বাধা পড়ে বা লোভকে আরও বাড়াতে চায় তখনই বাধে যুদ্ধ। যুদ্ধ বা শোষণ যখন চরম অবস্থায় এসে পৌঁছায় তখন তা একেবারে বিপ্লবের কিনারে এসে দাঁড়ায়। তবে অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে বিপ্লব গাছ থেকে পড়বে না, বা মানুষের দুঃখকষ্ট বাড়লেই বিপ্লব হবে এমন কথাও নয়—তার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে।

এ ছাড়াও এখান থেকেই লেনিন সর্বহারার বিপ্লবে জয়লাভের প্রশ্নে এক নতুন পথ ধরলেন। আগেকার চিন্তা,—যেমন অনেকগুলি পুঁজিবাদীদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ হলে তবেই একসঙ্গে বিপ্লব সংঘটিত হবে—এই পুরানো বিশ্বাসকে বাতিল করে দিয়ে লেনিন বললেন যে, সুরুতে অল্প কয়েকটা দেশে,—এমন কি পৃথক ভাবে একটা পুঁজিবাদী দেশেও বিপ্লবের জয়পতাকা উড্ডীন হতে পারে। লেনিনের এই আবিষ্কার ছিলো সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম। অসাধারণ ছিলো এর তাৎপর্য। অচিরেই রুশদেশে এক বিরাট এবং নতুন ধরণের সাফল্য নিয়ে হাজির হলো।

এই বইটি প্রকাশের পর থেকেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের তালে তালে পৃথিবীর মানচিত্রের দ্রুত অদল-বদল হতে থাকলো। সাম্রাজ্য-বাদীদের নরমেধ যুদ্ধ-যজ্ঞে কত প্রাণ যে বলি হলো, কে তার খবর রাখে। কত জীবনের তাজা গাছ যে শুকিয়ে গেলো, কত যৌবনের

মূল্য যে ঝরে পড়তে থাকলো তার ইয়ত্তা নেই। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের ভাগ্যে কত নিষ্ঠুর অত্যাচারের বন্যা যে বয়ে গেলো তার পরিমাপ করে কার সাধ্য। কিন্তু এরই মধ্যে, মাঝে মাঝে—কোথাও কোথাও কিছু প্রাণ-স্পন্দন, কিছু দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চাপা গর্জন শোনা যেতে লাগলো। অবশ্য তা এত অস্ফুট, এত অপরিণত যে সবায়ের পক্ষে তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিলো না।

তবুও তারই মধ্যে একজন ব্যক্তি—যাঁর নাম লেনিন,—সব কিছু লক্ষণ অনুধাবন করে ঠিক করলেন যে, এ সবই হচ্ছে আসন্ন প্রসবার যন্ত্রণা-অস্থিরতা ও স্বাস্থ্যক্ষীণতার মত। গর্ভবতী জননী ধরিত্রী শীঘ্রই বোধহয় তরুণ সূর্যের মত দীপ্তিমান এক বিপ্লব-সন্তান প্রসব করবেন। যিনি বন্ধনহীন প্রমিথিয়ুসের মত,—তেজোময় নচিকেতার মত, মৃত্যুরাজের কাছ থেকে বিশ্বমানবেব সুখ ও মঙ্গলের অগ্নি অর্জন করে নিয়ে আসবেন। যাতে সব অত্যাচার আর শোষণের আবর্জনা পুড়ে যাবে—স্থষ্টি হবে সমাজবাদের অভিনব স্বর্গ। যেখানে 'আমরা সবাই রাজা—আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।

ঠিক এই পটভূমিকায় রচিত হলো লেনিনের আরও একটি মূল্যবান রচনা 'সর্বহারার বিপ্লবে যুদ্ধ বিষয়ক কর্মপন্থা' [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯১৬]।

জাগো! জাগো!! জাগো!!! ওঠো—তোমার প্রাপ্যকে বুঝে নাও। তুমি না অর্জন করলে কেউ তোমাকে দেবে না। মানব-মুক্তির মহান স্বাধীনতা কেউ লাভ করতে পারে না,—তাকে অর্জন করতে হয়। ঐ স্বর্ণকুমারীকে লাভ করতে হলে ধনিক-জমিদার, সাম্রাজ্যবাদীব প্রাণ-ভোমরাকে বধ করতেই হবে। আর তখন সাত-শ, শত শত রাক্ষসীর বিরুদ্ধে সুরু হয়ে যাবে তোমার প্রচণ্ড লড়াই—ভীষণ যুদ্ধ, প্রচুর রক্তপাত—লাখো লাখো জান-কোরবান। আর লেনিনের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও দূরদৃষ্টির ফলে তা প্রথমই সুরু হলো রাশিয়াতে।

সেই বারো বছর আগে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে একটি রক্তঝরা রবিবার এসেছিলো—যেদিন সেন্ট পিটার্সবুর্গের* রাস্তা হাজারো নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিলো। সেই দিনটিকে স্মরণ করে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে পিটার্সবুর্গে একটা বিরাট যুদ্ধ-বিরোধী শোভাযাত্রা বেরোয়। এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছালো মস্কো, বাকু, নিজনিনভ্‌গরোদ প্রভৃতি আরোও—আরোও অনেক জায়গায়। সেই ঢেউ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো।

শোভাযাত্রা-সমাবেশ থেকে হঠাৎ ধর্মঘট—বন্ধ, একেবারে অচলাবস্থা। এই সব ধর্মঘটে কোথাও হাজার হাজার—কোথাও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র প্রমুখেরা যোগদান করেছিলো। তারা কলকল নিনাদিত কোটি কোটি কণ্ঠে—রুদ্র ভাষায় দাবী জানালো ঃ 'স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক!' জারের অত্যাচার খতম হোক!' 'শ্রমিক-কৃষক হত্যাকারী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ হোক!' 'রুটি-রুজির ব্যবস্থা চাই।'....ইত্যাদি....ইত্যাদি....ইত্যাদি।

জার প্রথমে চেষ্টা করতে লাগলেন—পুলিশ, সৈন্য, ইত্যাদি দিয়ে—বন্দুক দিয়ে এই সব চাওয়া—দাবী-আন্দোলন-ধর্মঘটকে ধ্বংস করতে। কিন্তু তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করবার ক্ষমতা আর কারও রইলো না। মহাকালের রুদ্ররোষ থেকে কেউ আর তাঁদের বাঁচাতে পারলো না। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকের এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন বুর্জোয়া সরকার। অস্থায়ীভাবে ক্ষমতা দখল করলো জনগণ—নিচে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষ অদ্ভুত বিস্ময়ে চোখ মেলে তাকালো যেন,—বুক ভরে তারা স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে লাগলো। বাক্, মুদ্রণ, ইত্যাদি অনেক বিষয়ের

* ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে পিটার্সবুর্গের নাম পাল্টে 'পেত্রোগ্রাদ' রাখা হয়।—লেখক

স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো—গোপন ঘাঁটি থেকে বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক কর্মীরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। স্তালিন, জেজিনস্কি, ইয়ে, ইয়ারোশ্লাভস্কি প্রমুখেরা বাইরে এলেন—জেল এবং নির্বাসন থেকে। বলশেভিক পার্টির বিখ্যাত ও প্রিয় মুখপত্র 'প্রাভদা' আবার প্রকাশিত হতে থাকলো [মার্চ ৫, ১৯১৭]। রাশিয়া তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এই মুক্তি আন্দোলন 'ফেবরুয়ারী বিপ্লব' [February Revolution] নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯১৭-র ২২শে ফেবরুয়ারী জুরিখের 'জন ভবনে' ১৯০৫-এর ঘটনার স্মরণে বক্তৃতা দিয়ে লেনিন বলেছিলেন : 'য়ুরোপেব এই মৃত্যু-স্তব্ধতা দেখে আমরা যেন ভুল না করি। কারণ, য়ুরোপ এখন বিপ্লবী গর্ভাবস্থায়'। কিছুদিনেব মধ্যেই লেনিনের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো।

কিন্তু একি হলো। অনেক কষ্ট—অনেক রক্তপাতের পর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো, তা কেমন যেন ধোঁকাবাজী, আর ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে। সুবিধাবাদীরা জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যেন নিজেদেব স্বার্থমত অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে চাইছে।

লেনিন 'প্রাভদা' পত্রিকায 'দূরের চিঠি' [*Letters from A far*] নামে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। তাতে বর্তমান অবস্থায় বলশেভিকদের কি কর্তব্য, জনগণকে প্রাথমিক অবস্থায হলেও বিপ্লব সংঘটিত করার জন্যে ধন্যবাদ দিযে, নানা ধবণেব লেখা লিখেছিলেন। কিন্তু 'প্রাভদা'র সম্পাদকমণ্ডলী সেই চিঠিগুলির সবই প্রায় নিজেদের কাছে রেখে দিযে শুধু মাত্র প্রথমটি ছাপিয়ে দেন—তাও খুবই সংক্ষিপ্ত আকাবে, অনেক কাট-ছাঁট করে।

আসলে এই 'ফেবরুয়ারী বিপ্লবে'র পর যে অস্থায়ী সরকার তৈরী হয়েছিলো—তা ছিলো পাচ মিশালী মত আর পথের লোক নিযে তাতে ছিলো মেনশেভিকরা, সোশ্যালিস্ট-বিপ্লবীরা, বুর্জোয়া কাদেত পার্টির [বড়লোকদের পার্টি] লোকেরা, অক্টোব্রিস্টরা [এরা শুধু বড় বড় ধনী ও জমিদারদের স্বার্থই দেখতো] এবং স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু বলশেভিকরা। কিন্তু প্রথমে অন্য সকলেরা দলে

এতো ভারি ছিলো যে, বলশেভিকরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারতো না। তাই অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলো, জনসাধারণের কোন দাবী-দাওয়া দেখলো না, কোনো কোনো জায়গায় বা শ্রমিক-কৃষকদের দাবীকে পূর্বের মতোই পুলিশ-মিলিটারী দিয়েও দমন করতে চাইলো। এমন কি যেসব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা —যারা জারের অত্যাচারে দেশের বাইরে বসবাস করছিলো, তারা যখন এই নতুন বৈপ্লবিক অবস্থায় দেশে ফিরতে চাইলো; তখন বিদেশী সামরিক সরকাবদের কাছে 'কালো তালিকা' [Black List] পাঠিয়ে তাদের দেশে ফেবার পথ বন্ধ করতে চাইলো [লেনিন এবং আরও অনেক বলশেভিকদেব নাম এই তালিকায় ছিলো]।

পাঠকগণ একটু মিলিয়ে দেখবেন তো—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগাস্ট ইংরেজরা স্বাধীনতা দিয়ে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত —আমাদের অবস্থার সঙ্গে। আশ্চর্য! ইতিহাস কি নিষ্ঠুর, কি অমোঘ, নইলে আমরা একটা 'লেনিন' পেলাম না!

দূর থেকে হলেও, লেনিন সব কিছুই লক্ষ্য কবছিলেন। তিনি নতুন অস্থাযী সরকারেব চরিত্র আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। কেন না তিনি 'দূরের চিঠি'তে লেখেন: 'এই সাময়িক সরকারকে বিশ্বাস করা চলবে না। বুর্জোয়াদের পাকা হয়ে বসবার আগেই তাদের উৎখাত করে প্রকৃত শ্রমিক-কৃষক রাজ কায়েম করতে হবে।' তিনি আরও লেখেন: 'গতকাল আপনারা বাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সর্বহারা জনগণের যে প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়েছেন, তা ইতিহাস হয়ে রইলো। কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। ফের সেই একই রকম বীরত্বের সঙ্গে জমিদার আর পুঁজিপতিদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে হবে। অতএব তৈরী থাকুন।' এর সঙ্গে তিনি দেশের বলশেভিকদের প্রতিও এক নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন: 'কমরেড, আপনাদের বিশ্রামের সময় নেই। এখনও আসল কাজ

বাকী। তাই আপনাদের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে সত্যিকারের দুঃখাবসান ঘটবে সেই দিন, যেদিন সর্বহারা মানুষের অধিকারে আসবে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা এবং উৎপাদনের সকল যন্ত্রগুলো'। ফেবরুয়ারী বিপ্লবের পর লেনিনের এইসব বক্তব্য যে কতখানি সত্য ছিলো, তা এব পরের ঘটনাগুলো নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত করেছে।

যখন এই রকম অবস্থা, তখন দেশে ফেরবার জন্যে লেনিন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ছটফট করতে থাকেন। সত্যিই তো, যার ব্যথা সেই জানে।—দেশের পরিস্থিতি, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অবস্থা লেনিন ছাড়া প্রকৃতভাবে আর কে-ই বা অনুধাবন কবতে পারবে। সেই জন্যে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। নানা ফন্দী-ফিকিরের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করতে থাকলেন—কি করে দেশে ফেরা যায়। এই অবস্থার বর্ণনা করে ক্রুপস্কায়া লিখেছেন: "ইলিচের রাতের ঘুম চলে গেল... একদিন মাঝরাতে তিনি বলে উঠলেন: 'তুমি জানো আমি একজন বোবা সুইডিশ্ হিসেবে পাশপোর্ট নিয়ে চলে যেতে পারি।' আমি হেসে বললাম: 'এটা কোন কাজের হবে না। কেননা তুমি ঘুমের ঘোরে কথা বলে উঠতে পারো। তুমি হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তোমার কর্মীদের দেখতে পাবে এবং বিড়বিড় করে তাদের উদ্দেশ্যে বকতে থাকবে, 'কি জঞ্জাল! কি আবর্জনা!' আর তখন সকলেই জানতে পেরে যাবে যে তুমি সুইডিশ্ নও।"

কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না। দু-মাসেরও বেশি হয়, কোন ভাবেই দেশের মাটিতে পা রাখতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি তো জানেন যে, 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।' তাই তাঁর প্রবল ইচ্ছা-শক্তিই শেষকালে জয়লাভ করলো। যদিও বহু কষ্টে,—অনেক কায়দায়, তবুও শেষকালে সুইজারল্যাণ্ডের কমরেডদের সাহায্যে, বহু কসরৎ করে তিনি, একদল বলশেভিক, আর কিছু প্রবাসী রুশদের সঙ্গে স্বদেশের উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলেন [এপ্রিল ৯, ১৯১৭]।

বিদায় সুইজারল্যাণ্ড! বিদায় জার্মান-প্যারিস-অষ্ট্রিয়া! বিদায় আমার সমস্ত প্রবাসী জানা-অজানা বন্ধুগণ। তোমাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অন্তরতম কৃতজ্ঞতা জানাই। বিদায়! বিদায়!! বিদায়!!!

৯.

'বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জায়গায় সর্বহারা জনগণের রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম—সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অসম্ভব।'

লেনিন।

চলো। চলো!! চলো!!! অন্ধকার থেকে আলোর জগতে চলো। বন্ধন থেকে মুক্তির দেশে চলো। যাত্রা করো—যাত্রা করো যাত্রী-দল। চির ধাবমানতার এই তাৎপর্যময় আহ্বানে সাড়া দিয়েই—রাশিয়ার ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে লেনিন এসে পৌঁছোলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে। ১৬ই এপ্রিল, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রাত বোধহয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আর স্মরণীয় তাৎপর্য বয়ে নিয়ে এসেছিলো। ঐদিন, দীর্ঘ দশ বছর পরে,—লেনিন পিতৃভূমির বুকে পা রেখে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলেন। আঃ! আমার প্রিয় পিতৃভূমি! আমার স্বপ্নের স্বর্গপুরী—আমার যৌবনের উপবন—আমার প্রাণের প্রাণ।

এই দিনটাকে একজন সোভিয়েত চিত্রশিল্পী তাঁর নিজের আঁকা এক ছবিতে এইভাবে দেখিয়েছেন: 'পিটার্সবুর্গের [তখনকার পেত্রোগ্রাদ: এখনকার লেনিনগ্রাদ] এক অন্ধকার রাত। একটা খুব বড় চত্তরের চারদিকে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রমিক, সৈনিক, এবং নাবিকেরা। আর একটা সাঁজোয়া গাড়ীর [যুদ্ধের ট্যাঙ্ক] ওপরে দাঁড়িয়ে লেনিন জনতার সামনে প্রদীপ্ত কণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছেন।'

এ ছবি, শুধু ছবি-ই নয়। এক সত্যিকারের কল্পনা—এক অভিনব

ঘটনার অপূর্ব রঙ আর রেখার প্রতিরূপ। সত্যিই সেদিন রাতে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এসে পিটার্সবুর্গে পৌঁছোলে মহানন্দে এবং মহোল্লাসে বিপ্লবী রাশিয়া আপন অন্তরের আসনে ঠাঁই করে দিলো তার প্রিয় কমরেডকে, মহান নেতাকে। লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হাজার হাজার নরনারী এসে জমা হলো। সৈনিক আর নাবিকদের বিপ্লবী বাহিনী তাঁকে দিলো গার্ড অব অনার। হাজারো কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো: 'স্বাগত লেনিন'। 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'।

এই সমস্ত ধ্বনি, করতালি, আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে লেনিন উঠে দাঁড়ালেন একটা সাঁজোয়া গাড়ীর ছাদে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি প্রদীপ্ত কণ্ঠে—দৃঢ় বজ্রনিন্দিত ভাষায়, আহ্বান জানালেন সংগ্রামের, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, সোভিয়েত [সোভিয়েত কথার অর্থ হলো শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নির্বাচিত পরিষদ] কর্তৃক পূর্ণ ক্ষমতা দখলের। পূর্ণিমার টানে—জোয়ারের আবেগে সাগরের জল যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, ঠিক তেমনি লেনিনের আবেগময় উপস্থিতি—উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৃপ্ত বক্তৃতা, রুশ মেহনতি জনসাধারণকে দারুণভাবে জাগিয়ে তুললো: 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে চিত্ত ভাবনাহীন'। তাই এতো শুধু দেশে পৌঁছোনো নয়—এক অভিনব কাজের সমুদ্রে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়া—এক অসাধারণ জীবন-যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর আয়োজন করা।

লেনিন ক্রুপস্কায়াকে নিয়ে তাঁর বোন-ভগ্নিপতি—আন্না এবং মার্ক-এর পিটার্সবুর্গের বাসায় আশ্রয় নিলেন [৪৮/৯, সিরোকায়া স্ট্রীট, ফ্ল্যাট ২৪, পেত্রোগ্রাদস্কায়া স্তোরোনা। বর্তমানে: ৫২, লেনিন স্ট্রীট]।

এর পরের দিন সকালেই, [১৭ই এপ্রিল] লেনিন 'অখিল রুশীয় সোভিয়েত শ্রমিকদের সম্মেলনে'র বলশেভিক প্রতিনিধিদের এক সভায় 'বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারার কর্তব্য' নামে একটা বক্তৃতা দিলেন। সভা বসেছিলো তরিদা প্রাসাদে। এইটিই তাঁর 'এপ্রিল

'থিসিস' নামে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে দিয়ে তিনি পার্টির সামনে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে উত্তরণে বিজ্ঞানভিত্তিক সংগ্রামের পরিকল্পনাটি উপস্থিত করেন। এবং এর পরেই বলশেভিকদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত আওয়াজ উঠতে থাকে: 'অস্থায়ী সরকারকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নয়, কোন সমর্থন নয়।' এবং 'সোভিয়েতকে সর্বশক্তিময় করতে হবে।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়—রাশিয়ার পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'এপ্রিল থিসিসে'র মূল্যায়নের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। এই 'থিসিসে'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কথা হলো আসল তা হচ্ছে: লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস' গঠনমূলক মার্কসবাদ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। একটি নতুন এবং প্রকৃত মার্কসীয় বিপ্লবী পথে এই থিসিস পার্টিকে পরিচালিত করে এবং কর্মসূচী ও কৌশলগত অভিনবত্বের দিক থেকে তাকে সশস্ত্র করে তোলে—যার ফলে, পার্টি প্রচণ্ড গতিময় এক শক্তি অর্জন করে। এই থিসিসের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিজয় অর্জনের জন্যে, লেনিন পার্টিকে নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণী-সংগ্রামের পথে পরিচালিত করেন। একটি মাত্র রাষ্ট্রেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে—লেনিনের এই অতি উৎকৃষ্ট অভিমত ছিলো তাঁর বর্তমান 'থিসিসের ভিত্তি'।

এর কয়েকদিন পরেই ৭ থেকে ১২মে পিটার্সবুর্গে 'রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি'র একটি সম্মেলন বসলো। এইটাই ছিলো পার্টির সপ্তম সম্মেলন। লেনিন যথারীতি সম্মেলনের পরিচালনার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন। এখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে—বিশেষতঃ বলশেভিকদের এখন কি কর্তব্য—তা খুব বিস্তারিতভাবে এবং খোলাখুলি আলোচনা হয়।

ফেবরুয়ারী বিপ্লবের পর দেশের এই হচ্ছে রাজনৈতিক অবস্থা। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড প্রভৃতি মিত্রশক্তির কাছে ক্রমাগত মার খেতে খেতে জার্মানীর অবস্থা হয়ে উঠেছে কাহিল—ধনে-প্রাণে মারা পড়তে চলেছে। ফলে, জার্মানীর মিতা যারা—

সেই অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতির অবস্থাও খুবই শোচনীয়। এর মধ্যে বোধহয় সব চেয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে রাশিয়া। ভোগায় পড়ে লড়াই করতে গিয়ে বুঝি তার প্যাজ-পয়জার দুই-ই হলো। কারণ, এই সময়ে দেশের হাঁড়ির খবর নিতে গিয়ে দেখি—ভাঁড়ে মা-ভবানী। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট চরমে গিয়ে উঠেছে। সব কিছুই প্রায় ভেঙ্গে চুরমার। রুটি, মাংস, চিনির—জীবন-ধারণের প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রচণ্ড অভাব। পেটে ভাত নেই—পরণে কাপড় নেই। জনগণ অনশনক্লিষ্ট। প্রচণ্ড শীতে, বস্ত্রহীন অবস্থায়—কুঁকড়ে মরতে বসেছে সব। এর মধ্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত যুদ্ধ বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে। বহু পরিবার আত্মীয়স্বজনকেও হারিয়েছে। কিন্তু এই ভাবে তো আর বেশি দিন চলতে পারে না। এব থেকে যে বাঁচতেই হবে। মুক্তির আলোর সন্ধানে যে সব পথহারার দল ঘুরে মরছে—তাদের পথের সন্ধান জানাতেই হবে।

........কি হবে?....কে আমাদের বাঁচাবে?....কি করা যায়?.... বাঁচার পথ কোথায়?

লেনিন এই সব প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই যুদ্ধ লুণ্ঠনকারী, সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। ধনকুবেরদের লুঠের ভাণ্ডারের চাবি নিয়ে নিতে হবে,—অহঙ্কারী, ক্ষমতাবাজদের হাত থেকে শাসনদণ্ড কেড়ে নিতে হবে। এটাই হলো শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের প্রধানতম কাজ। একমাত্র এই পথেই আসবে শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতা। উন্মুক্ত হবে নতুন জীবনের রাস্তা। অস্থায়ী সবকারকে বিশ্বাস করা চলে না। তাকে সমর্থন কবা হবে না কিছুতেই। সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নিতে চাই সোভিয়েত-গুলির হাতে।

কিন্তু এই নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তো রাতারাতি গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তার সৃষ্টির জন্যে চাই সময়, সংগ্রাম এবং কঠোর পরিশ্রম। সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগুতে হলে

প্রথমেই কাটিয়ে উঠতে হবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ; দূর করতে হবে অনাহার ও দারিদ্র্য। প্রয়োজন হবে এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলার।

এই সময় লেনিন সমস্ত বলশেভিকদের ওপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জরুরী এক কাজের দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন শ্রমিক-কৃষকদের একান্তভাবে বুঝিয়ে দেয় যে,—ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর গড়ে ওঠা অস্থায়ী সরকার আসলে বুর্জোয়াদের সরকার। বড়লোকদের জন্যে, বড়লোকদের হয়ে, বড়-লোকদের সরকার। এ তাদের রুটি-রুজি-ক্ষুধার কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। জনগণকে এই সত্যটি উপলব্ধি করাতেই হবে। এবং তারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করবে—প্রাণ পর্যন্ত দিতে পেছপা হবে না।

গভীরভাবে ভেবে লেনিন এই যে কাজের নির্দেশ দিলেন, পার্টি তাকে দলের সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করলো। শুরু হলো এক নতুন ধরণের, ঝড়ে কাঁপা—অন্ধকারে ঢাকা—পথ চলা ;—রাশিয়ার ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়।—যে অধ্যায়ের নায়ক হচ্ছেন লেনিন, যে ঢেউ-এর দোলায় বিপদ-সমুদ্রের কর্ণধার হলেন লেনিন। তাই আমরা দেখি যে এই সময়ে এমন একটি দিনও যায় নি, যখন লেনিন কোন না কোন সভায় বক্তৃতা না করেছেন। তিনি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখেছেন—উত্তপ্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের—সুবিধাবাদীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। পার্টির প্রথম সারির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে—তার বিনিঃশেষ বিজয়ের জন্যে, ক্লান্তিহীন সংগ্রাম করেছেন।

এরই ফল হিসেবে 'অখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ১৯১৭ সালের জুন মাসের ১৭ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত। তাতে ১,০৯০ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেন এবং এঁদের মধ্যে ১০৫ জনই ছিলো বলশেভিক। এই অধিবেশনের

কর্মসূচীর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো: 'অস্থায়ী সরকার এবং বিপ্লবী গণতন্ত্র।'

এই অধিবেশনে সোশ্যালিস্ট-রিভোলিউশানারী ও মেনশেভিক পার্টিসহ বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিরা ঐ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন। সব বক্তৃতাই মূলত ছিলো প্রতিবিপ্লবী ও সুবিধাবাদের সুরে সুর মেলানো। তবুও সবাই বক্তৃতা দিচ্ছেন। নিজের নিজের মত আর পার্টির সুবিধে মতো যুক্তি হাজির করছেন। এমন সময়ে এঁদের মধ্যেকার একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে জোর গলায় বলে উঠলেন: 'ক্ষমতা হাতে নিতে পারে এবং নেওয়ার জন্যে তৈরী এমন কোন একটিও বিপ্লবী পার্টি আজকের রাশিয়ায় নেই।'

বক্তা বক্তব্য শেষ করে নিস্তব্ধ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। সব চুপ! একটা পিন পড়লেও শোনা যায়। এমন সময় সেই স্তব্ধ সভাকক্ষের মাঝখান থেকে একটা দৃঢ় অথচ গভীর-গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করলো: 'এরকম একটা পার্টিই আছে'।

সবাই চমকে উঠলো, কার এ কণ্ঠস্বর।—এ কণ্ঠস্বর আর কার হতে পারে! রাশিয়ায় তো মাত্র একজনই এরকম কণ্ঠে, এ কথা বলতে পারেন। এই কম্বুকণ্ঠ তো রাশিয়ায় মাত্র একজনেরই আছে। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছিলো। অস্থায়ী সরকার অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে কোন ভাবেই সক্ষম হলো না। ফলে, জনগণের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলতে থাকে—এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ এক অমূল্য, অথচ প্রত্যাশিত সুযোগ। ইতিহাসের নতুন ক্রান্তিকাল রচনার সুযোগ দোর গোড়ায় এসে গেছে। এ সুযোগ কোন ক্রমেই লেনিন ছাড়তে রাজী নন। তাই তিনি শ্রমিকশ্রেণী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত করবার আয়োজন করলেন। পার্টিকর্মীদের তৎপর হতে বললেন।

সোশ্যালিস্ট-রিভোলিউশনারী ও মেনশেভিকদের ইচ্ছে ছিলো যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হোক তাদের সুবিধাবাদী এবং প্রতিবিপ্লবী বক্তব্য অনুসারে। যাতে করে অস্থায়ী সরকার এবং সামরিক অভিযানের প্রতি সমর্থন জানানো যায়,—সহযোগিতা করা যায়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকেরা ঐসব বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলো। তারা আওয়াজ তুললো: 'যুদ্ধ নিপাত যাক্'! 'শান্তি দীর্ঘজীবী হোক'! 'সোভিয়েতগুলির হাতে 'সমস্ত ক্ষমতা চাই'।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন, প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিকদের এক মহতী মিছিল—কল্লোলিত এক জনসমুদ্র—বলশেভিকদের বক্তব্য এবং দাবী নিয়ে পিটার্সবুর্গের পথ পরিক্রমা করলো। পৃথকভাবে—একেবারে একক সংগঠনের জোরে, এই সমাবেশের সাফল্য বলশেভিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট জয় বয়ে নিয়ে এলো।

জুন মাসের শেষ থেকেই অত্যন্ত পরিশ্রম এবং কাজের চাপে লেনিনের শরীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে। অনিদ্রা এবং মাথার যন্ত্রণা তাঁকে অস্থির করে তুলতে থাকে। তিনি অনেকটা দায়ে পড়েই নেভোলা গ্রামে কয়েকদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। কিন্তু বিশ্রাম-সুখ তাঁর কপালে সইলো না। দু-দশদিনের মধ্যেই পিটার্সবুর্গের শ্রমিক অসন্তোষের এবং তার ওপর অস্থায়ী সরকারের অত্যাচারের খবর পেয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হলো। ফিরে এসে শুনলেন, দেখলেন যে, কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকার মেনশেভিক-বুর্জোয়াদের পাল্লায় পড়ে, যুদ্ধ চালাতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে রণক্ষেত্রগুলিতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। কিন্তু শ্রমিক, গরীব কৃষক ও সৈনিকেরা মনে প্রাণে যুদ্ধ চায় না। তারা জানে—লেনিনের শিক্ষায় বুঝেছে যে—যুদ্ধ মানেই দুঃখ-মৃত্যু আর সর্বগ্রাসী ধ্বংস।

সেই জন্যেই ৩রা জুলাই তারিখে শ্রমজীবী জনগণ আবার পিটার্সবুর্গের রাস্তায় বার হয়ে এলো। সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুললো। কিন্তু এ সময়েও বলশেভিকরা সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করতে চাইলেন না। কারণ তখনও সশস্ত্র কার্য-

কলাপ পরিচালনার পক্ষে পরিণত অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। কেন না, সৈন্যবাহিনী শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় তখনও সমর্থন করার জন্যে তৈরী হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত রকমের প্ররোচনা—যে কোন রকমের অশান্তি এড়াবার জন্যে; যাতে করে প্রতিক্রিয়াশীল অস্থায়ী সরকার কোন রকম দমন-পীড়নের সুযোগ না পায় তার উদ্দেশ্যে বলশেভিকরা ৪ঠা জুলাই তারিখের শ্রমিক ও সৈন্যদের বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। বলশেভিকদের উদ্যোগে এবং আন্তরিক চেষ্টায় বিরাট এই বিক্ষোভ-মিছিল একটা সুগঠিত ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের রূপ লাভ করলো।

এবারেও বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো। ঠিক দুপুর হয হয়, এমন সময় মিছিল সুরু হলো। পিটার্সবুর্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকেই শ্রমিকেরা এসে জড়ো হলো শহবেব রাস্তায়। পিটার্সবুর্গ বাহিনীর সৈন্যেরাও এই বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দিয়েছিলো। সারা শহর যেন তাদের দখলে চলে গেলো। প্রথমে তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে ক্ষেসিনস্কায়া প্রাসাদেব সামনে জড়ো হলো। এখানে একটা ছোট্ট মিটিংয়ের মতোও হলো। এমন সময সেখানে ক্রোনস্তাদ সেনাবাহিনীব মিছিলটিও এসে হাজিব হলো। চারিদিকে শুধু মাথা,—আর কালো মাথা। সারা জাযগাটা কেবল মানুষে মানুষে ভরে গেছে। তাদের গর্জনে—দাবী-দাওযাব বিক্ষোভে যেন ক্ষেসিনস্কায়া প্রাসাদটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে কে যেন ঝড়ের দিনের আতালান্তিক মহাসমুদ্রটাকে সেখানে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে। এই কল্লোলিত সমুদ্র এবারে চাইলো তাদের নেতা—তাদের প্রিয় পথপ্রদর্শক লেনিনকে। তিনি তাদের সামনে এসে হাজির হোন। তাদের কাছে কিছু বলুন। তাদের কানে সাহসের মন্ত্র শুনিয়ে দিন।

কিন্তু লেনিন অত্যন্ত অসুস্থ। তা না হলে তাঁকে ডাকতে হতো না। এই মহান দৃশ্যের মাঝখানে তিনি নিজে থেকেই কখন এসে হাজির হয়ে যেতেন। বিদ্যুৎ কি মেঘ ছেড়ে থাকতে পারে। তবুও

জনতার অনুরোধে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। জনতা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁদের সামনে সংক্ষেপে দু-চার কথা বললেন। সেই চির-পরিচিত কথা—সেই বহু শোনা কণ্ঠস্বর—আবেগে-অসুস্থতায় অল্প অল্প কাঁপছে। তিনি বললেন: "আপনাদের সকলকে আমার অন্তরের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে, পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের পক্ষে ক্রোনস্তাদের সংগ্রামী মহান সৈনিক ভাইদের। আপনারা সবাই সতর্ক, দৃঢ়, একতাবদ্ধ এবং সংকল্পে অটল থাকবেন—তা হলেই আমাদের যে মূল দাবী 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' তা অবশ্যই আদায় হবে। আপনারা আমার সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

এখান থেকে মিছিল তরিদা প্রাসাদের দিকে এগুতে থাকে। এই প্রাসাদেই হচ্ছে 'সোভিয়েত সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি'র এবং 'পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতে'র প্রধান কার্যালয়। সমাবেশ থেকে শ্লোগান উঠছিলো—তাদের হাতের ধ্বজাগুলোয় লেখা ছিলো: 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!' 'বুর্জোয়া মন্ত্রীরা নিপাত যাক!' 'রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা চাই!'

আন্দোলনের এই বিরাট জোয়ার—বিশাল ঢেউ—বুর্জোয়াদের, তাদের দালাল মেনশেভিক এবং সোশ্যাল-রিভোলিউশানারীদের ভয় পাইয়ে দিলো। পার্টি'র ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুরা আবার একটি জঘন্য অপরাধ করে বসলো—বিক্ষোভ মিছিলের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালালো। পিটার্সবুর্গের রাস্তা খেটে-খাওয়া মানুষের রক্তে আবার একবার লাল হয়ে উঠলো।—ঠিক যেমন বারো বছর আগে হয়েছিলো। তবে সেদিন আর এদিনে অনেক—অ—নে—ক ফারাক....।

তারপর। তারপরের ইতিহাস খুবই পুরোনো। বিশ্বাসঘাতকেরা ইতিহাসে আবার অমর হতে চাইলো। মানুষের নিদ্রাভঙ্গকে আর একবার চিরনিদ্রায় পরিণত করতে চাইলো। প্রতিবিপ্লবীরা

বলশেভিক পার্টির শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং দমননীতি প্রয়োগ করলো। চারিদিকে খানাতল্লাসী এবং গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ে গেলো। বলশেভিকদের ধরো আর মারো—জেলে ঢোকাও—নির্বাসনে পাঠাও। এমন কি রাশিয়াতে মৃত্যুদণ্ড আবার চালু করার দাবিও উঠলো।

৭ই জুলাই অস্থায়ী সরকার লেনিনকে ধরাব জন্যে ওয়ারেণ্ট বার করে। তাঁর বাসায় তল্লাসী চালায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলো, তিনি জার্মানীর চর। অস্থায়ী সরকার লেনিন ছাড়া আরও অনেক বলশেভিকদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের জন্যে পরোয়ানা জারী করলো। লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্যে—যাতে সামান্যতমও সাক্ষ্য পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে পুলিশ তাঁর ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে ফেললো। সমস্ত ঘরটা উল্টে-পাল্টে দিলো; —যেন কাঁচের বাসনের দোকানে ষাঁড় ঢুকেছিলো। সৌভাগ্যের বিষয়, এর আগেই,—খুব ভোরেই, লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া ঐ বাসা ছেড়ে চলে যান। এই সময়ের দিনরাত্তিরগুলো তাঁদের খুব কষ্টেব মধ্যে দিয়ে—লুকিয়ে, আত্মগোপন করে কাটতে থাকে। ৫ই থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত লেনিন পিটার্সবুর্গের এক শ্রমিকের ঘবে লুকিয়ে থাকেন।

লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা খানাতল্লাসী, জার্মানীর চর ইত্যাদি বলেই তারা ক্ষান্ত থাকলো না। এমন কি, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করতেও পেছপা হলো না। তাঁর সম্পর্কে বদনামের অভিযোগের—কুৎসার, উত্তর দেবার জন্যে অনেকেই তাঁকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্যে বলতে লাগলো। বিশেষ করে নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রীরা এবং মেনশেভিকরা। অবশ্য লেনিনের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসার বিপদ সম্পর্কে অবহিত হতে না পেরে কিছু কিছু বলশেভিকও এই মতে সায় দিতে থাকে। লেনিন স্ত্রী-বোন-ভগ্নিপতি—সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষে ঐ দিনই বিকেলের দিকে পার্টি কমরেডদের এক জরুরী

বৈঠকে তাঁর এই আত্মপ্রকাশের ও আদালতে হাজির হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। এই আলোচনার স্মৃতিচারণ করে এক কমরেড পরে প্রাভদায় লিখেছিলেন [১৯২৪, ২৮শে মার্চ] : "কমরেড মেগিন লেনিনের প্রকাশ্য বিচারে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর ও পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসার তীক্ষ্ণ জবাব দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু স্তালিন এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেন যে, 'অস্থায়ী সরকারের খয়ের খাঁ অফিসারেরা জেলে নিয়ে যাবার পথেই লেনিনকে গুলি করে মেরে ফেলবে।' লেনিনও মেগিনের বক্তব্যের পক্ষে কাজ করতে ইতস্তত করছিলেন।"

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে লেনিনকে বাঁচতে হলে আত্মগোপন করতেই হবে। এবং সেই অনুযায়ী ৯ই তারিখের রাত্তিরের দিকে একজন ফিনিশীয় কৃষকের ছদ্মবেশে তিনি পিটার্সবুর্গ ত্যাগ করলেন। এর আগে তিনি তাঁর দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। পরচুলা এবং টুপি পরে নিলেন। তাঁকে ঠিক একজন কৃষকের মত দেখতে হলো। সমস্তরকম সতর্কতা অবলম্বন করে তিনি এলেন স্টেশনে। শেষে ট্রেনে চড়ে নিরাপদে পৌঁছালেন ফিন সীমান্তের কাছে একটা ছোট্ট শহর রাজলিভ-এ।

রাজলিভে পৌঁছে লেনিন হলেন একজন ছদ্মবেশী ফিনিশীয় ঘেসুড়ে। আশ্রয়স্থল একটা পাতার কুঁড়ে। ঘেসুড়ে হিসেবে থাকতে হবে, তাই তাঁর ঘরে রাখা হলো কাস্তে, কুড়ুল, লোহার কড়াই, নিড়ুনি।—এই রকম সব টুকিটাকি দরকারী জিনিষ-পত্তর। তাঁর কাজে সাহায্য করবার এবং পাহারা দেবার জন্যে রইলেন এমেলিয়ানভ নামে একজন শ্রমিক। রাজলিভ স্টেশনের কাছে যে কুঁড়ে ঘরটিতে তিনি লুকিয়ে ছিলেন সেখানে এখন গ্রানিট পাথরের একটা স্মারকস্তম্ভ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। তার গায়ে লেখা রয়েছে : "এখানে, ১৯১৭ সালের জুলাই ও অগাস্ট মাসে, গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী আশ্রয়ে, বুর্জোয়াদের হাত থেকে আত্মগোপন করেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের নেতা এবং এখানে বসেই তিনি 'রাষ্ট্র

এবং বিপ্লব' [*The State and Revolution*] নামে বইটি লেখেন। সেই ঘটনার স্মারক হিসাবে আমরা এখানে গ্র্যানিটি পাথরের একটি তাঁবু তৈরী করে দিয়েছি।

: লেনিনের শহরের শ্রমিকবৃন্দ, ১৯২৭।"

এখানে এসেও লেনিনেব বিশ্রাম নেই। অক্লান্তভাবে তিনি কাজ করে চললেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জয় লাভের জন্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ এবং আবেদন রচনা করতে থাকলেন। এই সময়েই ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশন ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা অগাস্ট পর্যন্ত পিটার্সবুর্গ শহরে চলে। লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকে পাঠানো লেনিনের খসড়া প্রস্তাবটি এই অধিবেশনে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয় এবং শেষে সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করাও হয়। এখানকার আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব প্রস্তুতিই সবার আগে—সব প্রথমে, জায়গা পায়।

শরৎকাল শেষ হতে চলেছে। শীত বুড়ি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এখানে আর থাকা যাবে না। তাই লেনিনকে রাজলিভ থেকে সরে যেতে হবে। ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংফরস-এ। সেখানে এসেও লেনিনেব নেতৃত্বদানের কাজের বিরাম ছিলো না। কারণ, সময় এসে পড়েছে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আর দেরী নেই। জোর কদমে চলো ভাই। আরও জোরে এই পচা-গলা সমাজটাকে একটা ধাক্কা দাও।....আরও জোরে ....আরও একটু জোরে....

আমরা এই দীর্ঘ সময় ধরে দেখলাম যে রাশিয়া—তথা সমগ্র বিশ্বের সমাজ-দর্শন-অর্থনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে লেনিন মার্কসবাদের তত্ত্বকে আপন মনীষার দ্বারা অভিনব এবং বাস্তব রূপ দিয়ে গেলেন। সে কাজে সবচেয়ে যে তিনটি বিষয়কে তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তারা হচ্ছে: ক) তাঁর সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা; খ) তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা এবং গ) তাঁর

অবিশ্রাম ও নিরবচ্ছিন্ন লেখনী-চালনা। ধুলো-কাদা-মাটি মেশানো সোনাকে মনোহর অলঙ্কারে পরিণত করতে হলে স্বর্ণকারকে যেমন অবিরাম পরিশ্রম ও সৃজনী শক্তির পরিচয় দিতে হয়—এও অনেকটা যেন সেই রকম। তাই এই আত্মগোপন কালেও তাঁর কলম থেমে থাকলো না। তাঁর কাছ থেকে আমরা কয়েকটা মূল্যবান রচনা পেলাম। যেমন : 'রাষ্ট্র এবং বিপ্লব' [*The State and Revolution*], 'আসন্ন বিপর্যয় এবং তা থেকে পরিত্রাণের পথ' [*The Impending Catastrophe and How to Avart It*], 'বলশেভিকরা কি রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখতে পারবে'? [*Can The Bolseviks Retain State Power ?*] প্রভৃতি।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লেনিন বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পিটার্সবুর্গ এবং মস্কো কমিটির কাছে 'বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল করতেই হবে', 'মার্কসবাদ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান' নামে দুটি চিঠি লেখেন। এই চিঠি দুটোকে বলা চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ করার বিষয়ে 'সক্রিয় কর্মসূচী' [Action Programme]।

শুধু চিঠি লিখলেই তো কাজ হবে না। কেবল বক্তৃতা আর লেখা দিলেই তো আকাশ থেকে ধপ্ করে বিপ্লব পড়বে না। তার জন্যে কাজ চাই। সক্রিয় কর্মসূচীর সঙ্গে হাতে-পায়ে কাজও চাই। আর তার জন্যেই তিনি বিপ্লবী কর্মকেন্দ্রের আরও কাছে থাকতে চাইলেন। একেবারে মুখোমুখি। তিনি পিটার্সবুর্গ থেকে মাত্র উনসত্তর কিলোমিটার দূরের শহর ভিবর্গ-এ সরে আসার আয়োজন করলেন।

এই ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দেরই ১লা অক্টোবর তারিখে তিনি আরও একটা চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে আরও দৃঢ়ভাবে এবং সোচ্চারে ঘোষণা করা হলো : 'যদি সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থান ছাড়া ক্ষমতা দখল করা সম্ভব না হয়, তাহলে অবিলম্বে—আর এখনই—এই অভ্যুত্থান শুরু করা উচিত।' এই আহ্বান জানানোর পরের দিনই তিনি চলে এলেন পিটার্সবুর্গে। এখানে এসে তিনি গোপনে—একা একটা ঘরে বাস করতে থাকলেন।

এই সময় থেকেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সভাগুলো শহরের নানা জায়গায় গোপনে বসতে থাকে। প্রত্যেকটাতেই লেনিন সভাপতিত্ব করেন—সার্থক ভাবে, যুদ্ধের নিপুণ কায়দা-কানুন জানা সেনাপতির মত, সকলকে নির্দেশ দিতে থাকেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্টি ইউনিটগুলিতে সভা-সমিতি বসতে থাকে—বেশির ভাগ সময়েই গোপনে, লুকিয়ে লুকিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্যেরা শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিতে কাজকর্ম দেখবার জন্যে—সব ঠিকঠাক আছে কিনা তা বুঝে নেওয়ার জন্যে,—রাশিয়ার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ এবং ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে—গোপনে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

সব তৈরী। আয়োজন শেষ। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বক্ষণ এসে পড়েছে। রাশিয়ার আকাশে-বাতাসে বারুদের গন্ধ। লেনিনের নেতৃত্বে শোষিত মানুষের শেষ ও চরম অভ্যুত্থান শুরু হবে। তাতে হয় পরাজয়,—অথবা—চিরকালের মুক্তি। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ২৪শে অক্টোবর রাত্রে লেনিন এলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের স্মোলনি ভবনে।—এইটাকে করা হয়েছিলো বিপ্লব চালানোর সদর দপ্তর।

এই সময়ে যাঁরা হাজির ছিলেন—যাঁরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা পরে এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তের যে স্মৃতিচারণা করেছেন তা যেমন রোমাঞ্চকর—তেমনই উত্তেজনার আবেগে থরোথরো। তাঁরা বলেছেন: সেই ঐতিহাসিক রাত্রিতে স্মোলনি ছিলো উজ্জ্বল আলোকমালায় সাজানো এবং কর্মচাঞ্চল্যে মুখর। রেড গার্ডরা, সেনাবাহিনীর রেজিমেন্টগুলো, ফ্যাক্টরী এবং সামরিক কমিটি এই সব নানা জায়গার—হরেক রকম সংগঠনের প্রতিনিধিরা নির্দেশ পাবার জন্যে—কি ভাবে এগিয়ে যাবে তা জানবার জন্যে, একের পর এক আসতে থাকেন। সিগন্যালকর্মীরা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ইনস্টিটিউটের সামনের স্কোয়ারটিতে সাজোয়া গাড়ী, মোটর সাইকেল, বন্দুক ও মেশিনগান —আরও কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে রাখা ছিলো। লেনিন

এবং তাঁর সহকর্মীরা বিপ্লব পরিচালনার জন্যে সদর দপ্তরে হাজির হলেন। নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এটা একটা সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত। রাশিয়াতে যে শোষণের ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে বিনা বাধায় চলে এসেছে —তার একেবারে গোড়া ধরে টান দেবার সময় এসে গেছে। আর সর্বহারার এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে কে? কে তাকে আশা দেবে—তার পাশে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কে তার সঙ্গে জীবন-মরণ পণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে?....কেন, এতদিন যারা তার কাছে কাছেই ছিলো; সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে এসেছে। সেই সর্বহারার বন্ধু পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। জনগণ এবং দেশের জীবন-মরণ নির্ভর করছে যাদের কাজের উপরে। যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এক-একটি দুর্গ দখল করে নিচ্ছে।

'ফায়ার'!—আক্রমণ করো!....সামনের দুষমনকে হটিয়ে দাও। দুর্দমবেগে এগিয়ে চলো। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর ওপরে আঘাত হানা শুরু হলো—পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে—তীর-ঋজু এবং ক্ষিপ্রগতিতে। ২৫শে অক্টোবর [৭ই নভেম্বর] সকালের মধ্যে বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈন্যরা দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে ফেললো: পিটার্সবুর্গের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া নেভা নদীর উপরের সব সেতুগুলো বিপ্লবী-বাহিনীর দখলে চলে এলো। তারা একে একে অধিকার করে নিলো—কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টেলিগ্রাফ এজেন্সি, রেডিও স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র এবং ব্যাঙ্কগুলো।

অস্থায়ী সরকার পিছু হটতে হটতে শেষে গিয়ে আশ্রয় নিল 'উইন্টার প্যালেসে' [শীত প্রাসাদ]। উইন্টার প্যালেস দখল করতে হবে। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এইসব সিদ্ধান্তের কোনটাই লেনিন একা নিজের মত অনুযায়ী কারুর ওপর চাপিয়ে দিলেন না। তিনি সোভিয়েতের সভা ডাকলেন। যুদ্ধ জয়ের এই শেষ মুহূর্তেও একটা সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ সভা শুরু হলো সন্ধ্যের সময়। রাত ৮-৪০ মিনিটে তুমুল

হর্ষধ্বনির মধ্যে লেনিন এসে সভাকক্ষে ঢুকলেন। এত আনন্দের মধ্যেও কিন্তু তিনি উচ্ছ্বসিত নন। বাঁধনহারা নন। তিনি জানেন যে এখনও আসল কাজই বাকী। তাই কিছুটা যেন চিন্তামগ্ন। তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি 'শীত প্রাসাদ' আক্রমণের আদেশ দিলেন। বুর্জোয়া সরকারের শেষ ঘাঁটিটা দখল করে নেবার নির্দেশ দিতে আর বিলম্ব করলেন না। বাইরে সেই শেষ লড়ায়ের—চরম জয়ের, সঙ্কেত পৌঁছে দিলো 'অরোরা' যুদ্ধ জাহাজের ঐতিহাসিক তোপ। আর ঝড়ের বেগে—ঈশান কোণের রক্ত চক্ষুর ইঙ্গিতে কালবৈশাখীর মত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী 'উইণ্টার প্যালেস' দখল করে নিলো। তখন রাত প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে। ভোর হয় হয়....

........জয়ের সূর্যকে পৌঁছে দিয়ে ঐতিহাসিক ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর [৭ই নভেম্বর] ভোর হয়ে গেলো।

এর পরের ইতিহাস শুধু জয়ের—শুধুই সাফল্যের—কেবল কঠিন-কঠোর কর্তব্যের। এতদিন শত্রু ছিলো একজন—ধনী-মালিক-বড়লোক-বুর্জোয়া আর তার দালালেরা। এখন অনেক শত্রু। অশিক্ষা, রোগ, শোক, ক্ষুধা—অনেক—অ-নে-ক। তাই ধীর ভাবে চলতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় সব সিদ্ধান্ত করতে হবে। সোভিয়েত সরকারের অনুমোদিত প্রথম সনদ বা আদেশ—যা প্রচারিত হলো, সেটি হচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির বিষয়ে।

এর পরেই এলো কৃষক মুক্তির কথা। তাই জমি সংক্রান্ত নির্দেশটি ছিলো সোভিয়েত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দ্বিতীয় সনদ। এই সনদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী মহালগুলি তৎক্ষণাৎ বিনা ক্ষতিপূরণে দখল করা হলো। কৃষকদের প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির হাতে তা প্রয়োজন অনুযায়ী বেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

১৯১৭ সালের অক্টোবর [নতুন দিনপঞ্জী অনুযায়ী নভেম্বর] বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা। এই বিপ্লব শুধুমাত্র একটি দেশেই নয়, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা

করেছে। সমগ্র মানবতার সামনে উদ্ভাসিত করে তুলছে সমাজতন্ত্রের—শোষিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরাট, বিশাল, মহান রাজপথ।

১০.

'জনগণের ওপব বিশ্বাস হারানো আত্মহত্যাব সামিল।...'জনগণেব ওপর বিশ্বাস রাখো জয় তোমাদের হবেই।'

লেনিন

লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত নতুন রাশিয়া চেয়েছিল শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি। কিন্তু জনগণের—সাধারণ মানুষের শত্রুরা তা সহজে হতে দিতে চায় নি—দিতে চাইবার কথাও নয়।

চার বছরেরও বেশি সময় ধরে [১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত] সদ্যজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে শত্রুদের আক্রমণ ঠেকাতে এবং তা পরাজিত করার জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে—হয়েছে ত্যাগ স্বীকার করতে। অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করা গেছে, তা রক্ষা করতে রুশবাসীদের অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ হাসিমুখে সহ্য করতে হয়েছে। দিনের পর দিন অমানুষিক যন্ত্রণা পেতে হয়েছে এক এক সময় পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সঙ্কট-সঙ্কুল। এই বুঝি সব গেলো। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের গরমকালে রাশিয়া বিদেশী আক্রমণের বেড়াজালে পড়ে গেলো। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য উইনস্টন চার্চিল সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা এবং তাঁদের ধামাধরা চৌদ্দটা রাষ্ট্র একযোগে শিশু রাশিয়াকে আক্রমণ করবে। কমিউনিস্টদের শেষ করবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো বর্তমান সভ্যতার সব চেয়ে বড় শত্রু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তাদের সে সাধ সেদিনও পূর্ণ হয় নি—আজও হচ্ছে না। দেশের ভেতরের প্রতি-বিপ্লবীরাও চুপ করে বসে ছিলো না। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা

জানুয়ারি লেনিন যখন একটা সভা থেকে ফিরছিলেন, তখন দেশ ও জাতির শত্রু এক শয়তান সন্ত্রাসবাদী—তাঁর মোটর গাড়ি লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। কিন্তু যাঁর এখনও আসল কাজ বাকী—দেশের সর্বহারা শ্রেণীর প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা যাঁকে ঘিরে রেখেছে, তাঁকে মারে কে? তাই শয়তান তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারলো না।

আবার। ক-মাস যেতে না যেতেই—আবার লেনিনের ওপর আক্রমণ হলো। ওরা চাইছে সূর্যকে নিভিয়ে দিতে। কিন্তু তাই কি সম্ভব! ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে লেনিন মিচেলসন কারখানার একটি সভায় বক্তৃতা করতে যান। [বর্তমানে লেনিনের নামেই এই কারখানার নামকরণ করা হয়েছে]। সভা শেষে যখন তিনি একদল শ্রমিকের সঙ্গে গাড়ির দিকে চলছিলেন তখন একজন সোশ্যালিস্ট-রিভোলিউশনারী তাঁর ওপর গুলি ছোঁড়ে। তাঁর শরীরের দু-জায়গায় গুলি বেঁধে। তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে পড়েন। কয়েকদিন ধরে চললো যমে-মানুষে টানাটানি। লেনিন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত মানুষেরই জয় হলো। মানুষেরই প্রীতির টানে—স্নেহের জোরে তিনি আবার ফিরে এলেন। লেনিনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রতিদিন রাশিয়ার প্রতিটি কোণ থেকে—প্রতিটি জায়গা থেকে, দেশ-বিদেশের জানা-অজানা কত হাজার হাজার অঞ্চল বা ব্যক্তির কাছ থেকে, কত অসংখ্য চিঠি ও টেলিগ্রাম এসে মস্কোতে পৌঁছাতো তার আর লেখা-জোখা ছিলো না। তিনি আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠতে লাগলেন। যে ব্রত সেই সতের বছর বয়সে নিয়েছিলেন—তাকে অসমাপ্ত রেখে যে তিনি কোথাও যেতে পারেন না।—এমন কি, মরেও নয়। তাই মরা তাঁর হলো না। ধীরে ধীরে নতুন রাশিয়া তৈরীর কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। এবং প্রায় একমাস পরে চিকিৎসকেরা তাঁকে আবার কাজ শুরু করার অনুমতি দিলেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে, অর্থাৎ বিপ্লব সফল হবার পর থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তো বাইরের শত্রু—সাম্রাজ্যবাদী শোষক আর বুর্জোয়া লুঠেরা সমানে, নানাভাবে, হরেক রকম অছিলায় শ্রমিক-কৃষকদের এই'সব পাওয়ার দেশে'র বিরুদ্ধে যত রকমে সম্ভব আক্রমণ, ষড়যন্ত্র চালিয়ে এলো। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মান, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সৈন্যবাহিনী চারিদিক থেকে সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এলো। সেই ভয়ঙ্কর দিনে লেনিন কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাস হারালেন না। তাই জয় শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষদেরই হলো। লেনিন সগর্বে এর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন: 'আমরা সবাইকে হটিয়েছি। সকলকে রুখেছি।' তিনি আরো গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন: 'তাদের ক্ষয় নেই—তাদের পরাজয় নেই—সেখানে শক্তি দুর্ভেদ্য, সেখানে সাধারণ মানুষ, খেটে-খাওয়া শ্রমিক কৃষকরা জেগে উঠেছে—নিজেরা জেনেছে, অনুভব করেছে এবং নিজেরাই নিজেদের মত করে সব কিছু রক্ষা করছে। মেহনতী মানুষের ক্ষমতা সবচেয়ে দুদম আর অভ্রান্ত।'

অবশ্য অনেক কষ্ট—ত্যাগ ও পরিশ্রমের মূল্যে এই যুদ্ধকে জয় করতে হয়েছে। অভাব-অনটন-দারিদ্র্যে দেশটা প্রায় ছারখার হয়ে গেছে। লেনিনের কথায়: 'এ যেন শত্রুর আর্থিক উদ্দেশ্য সফল।'

কেন না, যুদ্ধের আগে যে অল্প পরিমাণ উৎপাদন হতো—তাও অনেক—অ-নে-ক কমে গেলো। কারখানাগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। কাঁচা মাল, জ্বালানি এবং উৎপাদন যন্ত্রের অভাবে সেগুলির প্রায় অচল হবার মতো অবস্থা হলো। ইস্পাত উৎপাদন একেবারে নেমে গেলো। সুতীবস্ত্রের বরাদ্ধ মাথা-পিছু এক মিটারেরও কম হয়ে গেলো। চিনির অভাবে ব্যবহার করা হতে থাকলো স্যাকারিন। পুরানো বাড়ীর কাঠ-কুঠো, তাদের ভাঙ্গা বেড়াকেই জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো হতে থাকলো। রেল-পরিবহনের অবস্থা একেবারে প্রায় বারোটা বেজে এসেছিলো। শ্রমিকদের দিন

কাটছে প্রায় অনাহারে। কৃষি ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। তাঁরা ক্রমে ক্রমে অশান্ত হয়ে পড়ছে। তাদের এই ক্ষোভকে উস্‌কে দেবার লোকেরও অভাব হলো না। চারদিক থেকে যেন নানা রকমের অশান্তি—অব্যবস্থা—বিশৃঙ্খলা অক্টোপাশের মত এই শিশু রাষ্ট্রকে শেষ করে দিতে চাইলো।

ঠিক এই সময়ে—১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস্‌ আসেন রাশিয়ায় বেড়াতে;—তার অভিনব বিপ্লবের অভূতপূর্ব আয়োজন দেখতে—তার প্রধান শিল্পী লেনিনের সঙ্গে আলাপ করতে। এই ভ্রমণের শেষে তিনি 'ছায়াচ্ছন্ন রাশিয়া' [*Russia In The Shadows*] নামে একটা বই লেখেন। এই বইতে তিনি রাশিয়ার সেই সময়কার ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করেন। এবং সব শেষে লেনিনকে 'ক্রেমলিনের স্বপ্নদ্রষ্টা' বলে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। কারণ, এই অবস্থাতেও লেনিন স্বপ্ন দেখছেন—বাঁচবার, পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার—উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলহীন অপরূপ এক পৃথিবী তৈরী করার। আশ্চর্য, ঐরকম অবস্থাতেও কি করে যে লেনিন নানা ধরণের উন্নয়নের—নতুন নতুন নির্মাণকার্যের স্বপ্ন দেখতে পারেন তা বোঝাই যায় না। ওয়েলস্‌ সাহেবও বুঝতে পারেন নি। তিনি সবকটাকেই অবাস্তবতার স্বপ্ন মনে করে খুব একচোট হেসেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে সোভিয়েত শাসনের দিন বুঝি বা ঘনিয়ে এসেছে। এ অবস্থাতেও 'গড়িব নতুন দেশ' বলে স্বপ্ন দেখা হয়তো বা পাগলের দ্বারাই শুধু সম্ভব।

এ সময়ে নতুন পরিকল্পনা চালু করা বা নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরী করার কথা কি ভাবে যে চিন্তা করা যায় তা তাঁর মত সাম্রাজ্যবাদী দেশের লোকের পক্ষে বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। ওয়েলস্‌ এর চোদ্দ বছর পরে আবার এসেছিলেন। তখন অবশ্য লেনিন ছিলেন না—। ওয়েলস্‌ সাহেব অবাক হয়ে—বিস্ময়ে হতবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে মহান রাশিয়ায় লেনিনের স্বপ্নের রোশনাই লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্ক হয়ে জ্বলছে।

শেষে পরিস্থিতি যখন আরো খারাপ হয়ে এলো, তখন বলশেভিক পার্টিকে বাধ্য হয়েই ঠিক করতে হলো যে, কিশোর বয়স্ক কমিউনিস্টদের যে সংগঠন রয়েছে সেই 'যুব কমিউনিস্ট লীগে'র সভ্যদেরও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। কোন উপায় নেই। দেশের শত্রুর দল চারদিকে ঘিরে রয়েছে। পিতৃভূমির স্বাধীনতা,—সম্মান, যে কোন উপায়েই হোক রাখতে হবে। যুদ্ধ আমরা চাই না। কিন্তু তাই বলে কেউ আমাদের মেরে যাবে, আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাবো—তাতো হতে পারে না। তাই তরুণগণ—তোমাদের হাতে বাধ্য হয়েই অস্ত্র তুলে দিতে হচ্ছে। এ যুদ্ধ নিজেকে বাঁচাবার যুদ্ধ—কাউকে হত্যা করবার জন্যে এই যুদ্ধ নয়। এই উদাত্ত আহ্বানে অনেক কষ্ট সহ্য করেও তরুণেরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই সময়ে কমসোমলের আঞ্চলিক কমিটিগুলির দরজায় এক মজাদার নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হলো : 'সকলেই যুদ্ধে গেছে ; কমিটির অফিস বন্ধ'।

আগেই আমরা দেখে এসেছি যে, গৃহযুদ্ধের সমস্ত সময়টাতেও লেনিন রাশিয়ায় নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনার সম্বন্ধে চিন্তা থেকে বিরত হন নি। দেশকে শিল্প-সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হবে, নিজস্ব ভারী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া উন্নতির অন্য কোন রাস্তা আছে বলে তিনি মনে করতেন না। সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভর করে চলা দূর করে, জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই দেশের এবং জাতির পক্ষে সব চেয়ে কল্যাণকর ও সম্মানজনক উপায়। এই সময় তিনি প্রায়ই বলতেন : 'হয় রাশিয়া দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে—নয়তো সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হয় উত্থান, নয় পতন'। কিন্তু পতন যে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পের দিক দিয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠা এমন কি তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াও রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

উন্নতির এই মহাযজ্ঞে গ্রামগুলোকে তো পেছনে ফেলে রাখলে চলবে না। তাকেও যে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। পিছিয়ে থাকা

গ্রামগুলোকেও নতুন সমাজতান্ত্রিক ধারায় নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের নতুন নতুন যন্ত্র দিতে হবে। ভাল বীজ ও সার ব্যবহার করতে শেখাতে হবে। কাঠের লাঙল এবং ঘোড়া দিয়ে চাষ করলে চলবে না। নতুন নতুন যন্ত্র ব্যবহার করে বেশ পাকা-পোক্ত খামারের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। লেনিন স্বপ্ন দেখতেন যে, এমন দিন আসবে যখন গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি চাষ করা হচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা-রোয়া-ফসল কাটা হচ্ছে। সবই হচ্ছে যন্ত্রে। আর এই জয়ে গর্বিত মানুষ নিজের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়ছে।—লেনিনের সেই স্বপ্ন আজকের রাশিয়ায়, বাস্তবে সত্যিই চেহারা পেয়েছে।

দেশের ভেঙে পড়া অবস্থার মধ্যেও লেনিন চিন্তা করেছেন কিভাবে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতি করা যায়। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের আলো। রাশিয়ার নতুন জীবনে সেই আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। শিল্পে উন্নতি, কৃষিতে সমৃদ্ধি, বিপ্লবে সাফল্য, শত্রুকে ধ্বংস, সবই মিথ্যে হয়ে যাবে—যদি লেখা-পড়ার ভালো ব্যবস্থা করা না যায়। অতএব নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করা হলো। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যেও স্কুল খোলা হলো। পুরানো ব্যবস্থায় যারা শিক্ষার সুযোগ পেতো না—যাদের কিছুই হবে না বলে হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো—তারাও সেখানে লেখা-পড়া শিখতে লাগলো। পড়ো—লেখো, নতুন যুগের নতুন মানুষ তোমরা—তোমাদের জীবনকেও আলোকিত করে নাও। সেই আলোয় চির-বিপ্লবী রাশিয়া,—উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা রাশিয়া—বিশ্বের সভায় সবার সেরা আসনটা লাভ করুক।

লেনিন চেয়েছিলেন যে রাশিয়া সারা বিশ্বের একটা শ্রেষ্ঠ আর দক্ষ রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত হোক। তাই তিনি লাল-ফিতের বাঁধন বা আমলাদের ঢিলেমি ও প্যাঁচ-কষা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর মত ছিলো যে প্রশাসনের কাজ চলবে ঘড়ির কাঁটার মত। যেমন নিখুঁত, তেমনিই ঋজু গতিতে। যে-সব প্রশাসন কর্মী এইভাবে

কাজ করে না, করতে চায় না, তাদের শাস্তিদান করা উচিত। দরকার হলে তাদের আদালতে বিচার করাও প্রয়োজন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও লেনিন সব সময়েই চেষ্টা করে এসেছেন যে, অপরাপর দেশের সঙ্গে যেন শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপম করা যায়। প্রয়োজন মত, দেশের ইজ্জত বাঁচিয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা করতেও তাঁর আপত্তি ছিলো না। এমন কি, সুবিধেমতো ও ভদ্রলোকের সর্তে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতীও ছিলেন তিনি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে গোড়া থেকেই, লেনিনের নির্দেশিত পথে—অপরাপর জাতির প্রতি শান্তি এবং মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে এসেছে। তাই দেখি যে, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ইতালির জেনোয়া শহরে যেই একটা শান্তি সম্মেলন হলো—অমনি সোভিয়েত য়ুনিয়নও তাতে যোগ দিলো। লেনিন সোভিয়েত প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন বেশ পরিষ্কার ভাষায় এবং মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে শান্তি আমরা অন্তরের সঙ্গেই চাই। তাই সকলে মিলে যদি অস্ত্র তৈরী কমাতে চায় তবে তাতে আমরাও একমত।

পরেও আমরা দেখেছি যে, লেনিন সোভিয়েত জনগণের পক্ষে যে কোনো দামে শান্তি ক্রয় করছেন। তাই ট্রটস্কি যখন 'ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি'তে সই করতে রাজী হন না, উল্টে নিজের জেদ ও মত বজায় রাখবার জন্যে বিপ্লবী বুলি আওড়ান—তখন লেনিন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করেন। সত্যি কথা বলতে কি, লেনিনের একান্ত ইচ্ছা ও জেদের ফলেই এই শান্তি চুক্তিতে সই করা হয়েছিলো। অন্য অনেকের মতলবে ট্রট্স্কি যদি তা না করতেন তবে সোভিয়েত সরকারকে পরে খুবই বিপদে পড়তে হতো।

আমরা জানি যে, লেনিন ছিলেন সোভিয়েত সরকারের সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি—এক কথায় প্রাণ-স্পন্দন। কিন্তু এই বিরাট

ব্যক্তিত্বের জীবন-যাপন কেমন ছিলো ? মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন ? এ সব জানতে খুবই ইচ্ছে হয় না কি ?....না! বেশী জেনে দরকার নেই। কারণ, তা হলেই আমাদের দেশের জননায়কদের [?] সঙ্গে তুলনা কবতে ইচ্ছে করবে। আর সেই তুলনায় ব্যথা বাড়বে, ক্ষোভ হবে, রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করবে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সাদাসিদে মানুষ। কোনো অহঙ্কার বা গর্ব তাঁর ছিলো না। তিনি নিজেব জন্যে মাইনে বাড়াবার প্রস্তাবে সবাসরি না করে দিয়েছিলেন। খেতেন একটি সাধারণ ক্যান্টিনে। লেনিন বেঁচে থাকতে ক্রেমলিনে তাঁর পড়াব ঘব এবং থাকার জায়গা যেমনটি ছিলো, ঠিক সেইভাবেই সেগুলিকে বেখে দেওয়া আছে। দর্শকেরা সেই ঘরের সাদাসিদে চেহাবা দেখে খুবই অবাক হয়ে যান। লেনিনেব স্বভাবেব সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো জনগণের—শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবী সৈনিক সকলের ওপব তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে লেনিনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লো। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে সকলেই পেড়াপীড়ি করতে থাকেন। শেষে সকলেব অনুরোধে—আব শরীরটাও নেহাত বে-তর হওয়ায় বাধ্য হয়ে কিছু দিনের জন্যে তিনি গেলেন গোর্কী শহরে। এই শহরটা মস্কো থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু এখানে বিশ্রাম নিতে এসে উল্টে উৎপত্তি হলো। তাঁকে এক গুরুতব ব্যাধিতে আক্রমণ কবলো। তাঁর ডান হাত এবং পা পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেলো। কথা জড়িয়ে আসতে লাগলো। সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কি করা যায়—কি হবে ? ডাক্তাবেরা তাঁদেব এই প্রিয় নেতার রোগ মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের সমস্ত বিদ্যে দিয়ে তাঁর অসুখ সারাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। শেষে প্রায় তিন সপ্তা বাদে তাঁর অবস্থার অনেকটা উন্নতি হলো। হাতে-পায়ে বেশ খানিকটা জোর এলো।

শরীরটা অনেকখানি সারিয়ে নিয়ে তিনিগ্রীষ্মের শেষদিকে মস্কোতে ফিরে আবার কাজকর্ম শুরু করলেন।

কাজ—কাজ—আর কাজ। এখনও আসল কাজ তো বাকী। সবে তো রোগ সেরেছে—তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার না হলে কি করে চলবে—! ঠিক তেমনি রাশিয়ার বিপ্লব শেষ হয়েছে—কিন্তু এখনই তো তাকে গড়ে তুলতে হবে। দৃঢ় পায়ে, জোর কদমে সামনের দিকে—সবাইকে ছাড়িয়ে—এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই জন্যেই তো তাঁর অসুস্থ শরীরের নামে দোহাই দিয়ে শুয়ে-বসে থাকলে চলবে না। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের তের তারিখে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে 'রুশ বিপ্লবের পাঁচ বছর এবং বিশ্ববিপ্লবের সম্ভাবনা' [*Five years of the Russian Revolution and the out-look for World Revolution*] সম্বন্ধে তিনি একটা বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বলিষ্ঠ এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন: 'দক্ষতার সঙ্গে ও ঠিক ঠিক মত কাজ করলে—বিশ্বাস-ঐক্য এবং সততা থাকলে বিশ্ব-বিপ্লবের সম্ভাবনা শুধু ভালই নয়, চমৎকারও বটে।'

নাঃ! আর চলছে না। শরীরটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। দুটো মাস যেতে না যেতেই স্বাস্থ্যের আবার অবনতি ঘটতে থাকলো। চিকিৎসকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। কি আর করা যায়—কাজে বড় ব্যাঘাত হচ্ছে। তবুও বাধ্য হয়েই তাঁকে আবার যেতে হলো গোর্কীতে; ১২ই ডিসেম্বর লেনিন মস্কোতে ফিরে এলেন। এসে ক্রেমলিনে তাঁর অফিসে আবার কাজে বসতে লাগলেন। কিন্তু এই শেষ। তিনি এরপর আর ক্রেমলিনে কাজ করতে আসতে পারেন নি। পরের দিন সকালেই তিনি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আবার গোর্কীতে ফিরে যান।

১৫ই ডিসেম্বর রাত্তিরে রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ হলো। চিকিৎসকেরা কড়া নির্দেশ দিলেন: তাঁর পড়াশুনা এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা আর চলবে না। অবশেষে ডিসেম্বর

মাসের শেষভাগে তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন এবং কাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রথমে তাঁকে রোজ ৫-১০ মিনিট মাত্র শ্রুতিলিখন দেবার অনুমতি দেওয়া হলো। দিন কয়েক পরে শরীরটা আরও একটু চাঙ্গা হলে তাঁকে রোজ আধঘণ্টার মতো কাজ করতে দিতে রাজি হলেন ডাক্তারেরা। ব্যাস, এখন আর এর বেশি নয়।

নিজের কাজের মূল্যবান সময়ের প্রত্যেকটি মিনিটের সদ্ব্যবহার লেনিন করতেন। শ্রুতিলিখন দিয়েই তিনি তাঁর কয়েকটা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করে ফেললেন: 'কংগ্রেসের কাছে চিঠি'; 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দান'; 'অধিজাতিদের সমস্যা অথবা স্বায়ত্তশাসন'; 'দিনলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা'; 'সমবায় সম্পর্কে'; 'আমাদের বিপ্লব'; 'শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কিভাবে পুনর্গঠিত করা উচিত'; 'অল্প হওয়া ভালো—কিন্তু অধিকতর ভালো হওয়া চাই';....ইত্যাদি। তাঁর এই প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি আজ চিরকালীন সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে যাঁরা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের জন্যে লড়াই করেছেন বা আজও করছেন, তাঁরা এগুলি বারবার করে পড়েছেন বা পড়ে থাকেন।

'আন্তর্জাতিকতা বলতে কি বোঝায়?' এই প্রশ্ন নিয়ে লেনিন অত্যন্ত মৌলিক এবং তত্বগত আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে পরিষ্কার ভাবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে—অথচ সূত্রাকারে বলেছেন: অত্যাচারী জাতি ও নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদ এবং বৃহৎ জাতি ও ক্ষুদ্র জাতির জাতীয়তাবাদ—এই দুটি বিষয়কে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন আছে। তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন যে, নানা ধরণের জাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সমতা বা সমান মর্যাদার কথা কখনো চলে না। তিনি আরো বলেন যে, জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুবিধাদান ও তাদের সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্যের বদলে আতিশয্য বরং অনেকগুণ ভালো। এই প্রবন্ধেই

লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : 'বিশ্ব ইতিহাসের সুপ্রভাত শুরু হবে সেইদিন যেদিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা মাটিতে পিষে থাকা মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। সেই সুউচ্চ মানবতা নিয়ে তারা প্রচণ্ড রকম ভাবে লড়াই আরম্ভ করবে, নিজেদের মুক্তির জন্যে—চূড়ান্ত দীর্ঘ এবং কঠিনতম সংগ্রাম সুরু হবে।'

'দিনলিপির কয়েকটি পাতা' [*Pages from a Diary*] নামে যে প্রবন্ধ লেনিন লিখেছিলেন, তাতে তিনি জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভিযানের কথা খুব বেশি করে আলোচনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনের মান এমন উন্নত করতে হবে যা বুর্জোয়া সমাজে কখনও সম্ভব হয় নি, এবং হবেও না। জনশিক্ষাব ব্যাপারে কাজের পরিধি ছোট হয়ে আছে দেখে তিনি এখানে দুঃখ প্রকাশ করেন। পুরাণো ধ্যান-ধারণার মাস্টার মশাইরা যাতে ভাঙ্গা-পচা-গলা গণ্ডীর বাইরে আসতে পারেন, তার জন্যে অনেক কিছুই করতে হবে। আজকে যে নতুন দিন সুরু হয়েছে, সেই নতুন দিনে নতুন নতুন সমস্যাগুলোর প্রতি তাঁদের সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষার নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদেরকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে।

'কৃষক ও শ্রমিকদের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কি ভাবে আমাদের পুনর্গঠিত করা উচিত' [*How we should Re-organise Workers & Peasants Inspection*] প্রবন্ধটিতে প্রথম সারির পার্টি সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের বিষয়ে বলা হযেছে। এখানে লেনিন মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষক। এই দুটো শ্রেণীব সহযোগিতার ভিত্তির উপরেই আমাদের শক্তি ও সমৃদ্ধির অট্টালিকাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই কাঠামোর মধ্যে 'নেপমেন' অর্থাৎ বুর্জোযাদের কয়েকটি শর্তে আমরা যোগদানের অনুমতি দিয়েছি। এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থার মতো। তিনি আরো বলেন : কৃষক জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে—সংগ্রামী

মৈত্রীতে অবিচল থাকবে। নইলে 'নেপমেন'-রা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিভেদ আনতে পারবে খুব সহজেই। আর এই লৌহ দৃঢ় ঐক্যের উপরেই নির্ভর করবে আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। যেসব অবস্থা ঐ ফাটলের কারণ হতে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। তাই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কনট্রোল কমিশন এবং গোটা পার্টিকে কঠোর ভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শরীর এতো খারাপ হওয়া সত্ত্বেও—একটু সুযোগ পেলেই কাজে একেবারে ডুবে যেতেন লেনিন। তাঁর একমাত্র বিশ্রাম ছিলো ক্রেমলিনের ময়দানে একটু পায়চারি করা, অথবা বিশেষ ছুটির দিনে ক্রুপস্কায়া এবং বোন মারিয়া ইলিনিচনার সঙ্গে মস্কোর কাছেই পাহাড়ের ধারে ধারে একটু বেড়ানো। কাজের চাপে এবং গুলির জখমের ফলে [একটা গুলি তখনও বের করা যায় নি] লেনিনের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকলো। তা আর কিছুতেই জোড়া লাগলো না। একটু ভালো হয়—আবার ভেঙে পড়ে। এইভাবেই চলে চলে—শেষে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে এসে পৌঁছালো। নিজের শরীরের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিলো না, কিন্তু কারও শরীর একটু খারাপ হলেই তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। যেমন, গোর্কির অসুখের কথা শুনেই লেনিন তাড়াতাড়ি তাঁকে স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই বছরের প্রথম থেকেই লেনিনের চিকিৎসকেরা তাঁর স্বাস্থ্য আবার ভালো করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯শে জানুয়ারি দ্বিতীয় সর্ব-রুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সেই অধিবেশনে কমরেড কালিনিন জানালেন যে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকের মতে লেনিন তাঁর রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ খুব শীঘ্রই আবার আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু এই আশা আর পূরণ হলো না। ২১শে জানুয়ারি তাঁর অবস্থা অসম্ভব খারাপের দিকে চলে গেলো। সকলের সব চেষ্টা—আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে সন্ধ্যে ছ-টা পঞ্চাশ মিনিটে মস্তিষ্কের রক্ত-

ক্ষণে তাঁর চোখে চিরনিদ্রা নেমে এলো। এক মহান সংগ্রামী জীবনের অবসান হলো।

তাঁর মৃত্যুর পর—সেই রাতেই, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের ও বিদেশের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশে এক বাণী প্রচার করে। লেনিনের অমর প্রাণ-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর কর্ম ও কথার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে তাতে বলা হলো: "মার্কসের পর শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে আমাদের সদ্য মৃত নেতা, শিক্ষক ও বন্ধু লেনিনের মতন এমন আর কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি। শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্রে যা কিছু যথার্থভাবে মহান এবং বীরোচিত, তার সমস্তই লেনিনের ব্যক্তিত্বে অপূর্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভয়শূন্য চিত্ত, লৌহদৃঢ় মনোবল, অনমনীয় ধৈর্য ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করার শক্তি, দাসত্ব ও নিপীড়নের প্রতি জ্বলন্ত এবং অবিনশ্বর ঘৃণা, পর্বত টলাবার মতো বিপ্লবী আবেগ, জনগণের সৃজনীশক্তিতে অসীম বিশ্বাস এবং বিরাট সাংগঠনিক প্রতিভা—এতগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন লেনিন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে সমগ্র বিশ্বের একটিমাত্র প্রতীক হচ্ছে তাঁর নাম—লেনিন।—লেনিনের ব্যক্তিত্ব।

"কিন্তু তাঁর দেহের মৃত্যু মানেই তাঁর আদর্শের মৃত্যু নয়। লেনিন বেঁচে রয়েছেন আমাদের পার্টির প্রত্যেকটি সভ্যের হৃদয়ে। আমাদের পার্টির প্রতিটি সভ্যই হচ্ছেন লেনিনের অংশ। সমগ্র কমিউনিস্ট পরিবার হলো লেনিনের যৌথ প্রতিমূর্তি।....আমাদের শিক্ষকের মৃত্যু আমাদের জীবন, কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি আঘাত হানলেও—সেই আঘাতই আমাদের সভ্যদের অধিকতর ঐক্যবদ্ধ করবে। আমরা ধনবাদের বিরুদ্ধ-অভিযানে ক্রমশঃ জয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদের চারদিকে মার্কসবাদের—লেনিনবাদের এক দুর্ভেদ্য জঙ্গীব্যূহ রচিত হয়েছে এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের সেই চূড়ান্ত জয়কে প্রতিহত করতে পারবে না।

'আমাদের পার্টি দীর্ঘজীবী এবং চিরজয়ী হোক্!' 'শ্রমিকশ্রেণী দীর্ঘজীবী হোক্'!"

হাওয়া পাওয়া আগুনের মত এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ সারা দেশে,—সারা দেশ থেকে সারা য়ুরোপে,—সমগ্র য়ুরোপ থেকে গোটা এশিয়ায়—সেখান থেকে পৃথিবীর এ প্রান্তে-ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো—লেনিন মারা গেছেন।....লেনিন আর আমাদের মধ্যে নেই।

২৩শে জানুয়ারী লেনিনের মরদেহ গোর্কী থেকে মস্কোয় আনা হলো। সেখানে য়ুনিয়ন ভবনের হলঘরে শবাধারটা রাখা হলো। যাতে জনসাধারণ তাদের প্রিয় নেতাকে শেষবারের মত দেখে নিতে পারে। শেষবারের মত তাঁকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে পারে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে পুরু বরফের আস্তরণ—সাদায় সাদা হয়ে আছে। তার মধ্যেও হাজার-হাজার—লক্ষ-লক্ষ শ্রমিক-কৃষক লাল-ফৌজ-কর্মচারী শিশু-নারী বৃদ্ধ-যুবক শোকে অধীর হয়ে তাদের প্রিয় নেতার মৃত-দেহের চারপাশে ঘুরে যাচ্ছে।....কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে সবাই।

শেষে—অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ২৭শে জানুয়ারী বিকেল চারটেয় লেনিনকে কবরস্থ করা হলো। ক্রেমলিন প্রাসাদের বাইরে—বিশেষ ভাবে তৈরী এক ম্যুজোলিয়মে তাঁকে সমাধিস্থ করে রাখা হয়েছে।

এর মধ্যে, সমাধির আগের দিন—২৬শে জানুয়ারি মস্কোর বলশয় থিয়েটার হলে 'সারা-রাশিয়া সোভিয়েতসমূহে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সদ্য-মৃত মহাগুরু এবং মহানায়ক কমরেড লেনিনের স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশে। সেদিনের সেই অধিবেশনের সুরুতেই স্তালিন যে শপথ-বাণীটি পাঠ করেছিলেন, তা-এই রকম ঃ

"কমরেডগণ! আমরা—কমিউনিস্টরা একটা বিশেষ ছাঁচে, একটা বিশেষ ধাতুতে গড়া মানুষ। আমাদের নিয়েই তৈরি শ্রমিক-শ্রেণীর মহান সংগ্রাম-নীতির্বিদ্ কমরেড লেনিনের সৈন্যবাহিনী। এই

সৈন্যবাহিনীর সৈন্য হওয়ার মতো সম্মান আর নেই। যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা কমরেড লেনিন,—সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে বড়ো পদবী আর নেই। তাই, এই রকম পার্টি'র সভ্য যে কেউ সহজেই হতে পারে না। এই পার্টি'র সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিপত্তির মুখে অটল থাকার যে ক্ষমতার প্রয়োজন—তা সকলের নেই। শ্রমিক শ্রেণীর সন্তান অভাব এবং সংগ্রামের সন্তান,—অবিশ্রান্ত দুঃখ-কষ্ট এবং সাহসী কর্মপ্রচেষ্টার সন্তান যারা, সকলের আগে তাদেরই এমন পার্টি'র সভ্য হওয়া উচিত। তাই লেনিন-পন্থীদের পার্টি', কমিউনিস্টদের পার্টি'কেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি' বলা হয়।

"আমাদের কাছ থেকে বিদায়কালে কমরেড লেনিন চেয়েছিলেন, যেন আমরা সেই পার্টি'র সদস্যপদের মহান সম্মানের বিশুদ্ধতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিই এবং তা রক্ষা করে চলি। কমরেড লেনিন! আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, তোমার নির্দেশ পালন করবো।

"পঁচিশ বছর ধরে কমরেড লেনিন আমাদের পার্টি'কে লালন করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ইস্পাত-কঠিন শ্রমিক পার্টি' হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জারতন্ত্র ও তার তাঁবেদারদের আঘাত, বুর্জোয়া ও জমিদারদের রোষানল, কোলচাক-দেনিকিনের সশস্ত্র আক্রমণ, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, পুঁজিবাদী ছাপাখানার শতমুখে প্রচারিত মিথ্যা অপবাদ এবং আক্রমণ....পঁচিশ বছর ধরে এইসব বৃশ্চিক আমাদের পার্টি'কে অবিরাম দংশন করেছে।

"আমাদের কাছ থেকে বিদায়কালে কমরেড লেনিন আরও চেয়েছিলেন যে, আমরা যেন পার্টির ঐক্যকে চোখের মণির মতন সযত্নে রক্ষা করে চলি। কমরেড লেনিন! আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, তোমার এই নির্দেশ আমরা সসম্মানে পালন করবো!

"শ্রমিকদের ভাগ্য ছিলো দুর্বিসহ এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত। চিরকাল তারা অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে। ক্রীতদাস ও মনিব, ভূমিদাস ও ভূম্যধিকারী, কৃষক ও জমিদার, শ্রমিক ও ধনিক,

নির্যাতিত ও অত্যাচারী—স্মরণাতীত কাল থেকে এইভাবেই চলেছে তুনিয়া—এবং আজও অধিকাংশ দেশের অবস্থাই হচ্ছে এই। শতাব্দীর পর শতাব্দী শত শত বার শ্রমজীবী মানুষ তাদের ঘাড়ের ওপর থেকে এই নির্যাতকদেব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা করায়ত্ত কবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই পরাজিত ও অপমানিত হয়ে তাবা হটে গিয়েছে। বুকে পোষণ করেছে বিদ্বেষ, অপমান, ক্রোধ এবং হতাশা; তুজ্ঞেয় স্বর্গরাজ্যের দিকে তাকিয়ে আশা করেছে—আকাঙ্ক্ষা করেছে যে ঃ সেইখানেই বুঝি তাদেব মুক্তি মিলবে।....অথচ তাদের গোলামির শৃঙ্খল অটুট রয়ে গেছে, কিংবা হয়ত পুবানো শৃঙ্খলের বদলে নতুন শৃঙ্খল দেখা দিয়েছে।.... যা পূর্বের মতই সমান কঠোব,—আগের মতই অধঃপতনের হাতিযাব।

"আমাদের দেশই একমাত্র দেশ, যেখানে নির্যাতিত, অধঃপতিত শ্রমজীবী মানুষ ধনিক-জমিদাবের শাসনের উচ্ছেদ করে শ্রমিক ও কৃষকের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কমবেডগণ, আপনাবাও জানেন এবং সারা তুনিযাও জানে যে এই বিরাট সংগ্রামে নেতৃত্ব কবেছেন কমবেড লেনিন এবং তাঁব পার্টি।

"লেনিনের মহত্ত্ব প্রধানত এইখানে যে, সোভিয়েত গণতন্ত্র সৃষ্টি করে তিনিই তুনিযার নির্যাতিত জনগণের চোখের সামনে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মুক্তির আশা—তুবাশা নয়। জমিদার-ধনিকের শাসন চিরকাল চলবে না। মেহনতেব তুনিয়া শ্রমজীবীদের দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে। আর সেটা হবে কোনো অবাস্তব পরলোকে নয়, এই মাটিব পৃথিবীতেই। এইভাবে কমরেড লেনিনই সাবা তুনিয়ার শ্রমিক এবং কৃষকের অন্তরে মুক্তির আশা জাগিযে দিয়েছেন। লেনিনের নাম তাই শোষিত শ্রমজীবী মানুষেব কাছে সবচেয়ে প্রিয নাম।

"আমাদের কাছ থেকে বিদায়কালে কমরেড লেনিন চেয়েছিলেন ঃ আমরা যেন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রহরা দিয়ে রক্ষা করি; শক্তিশালী করে তুলি। কমবেড লেনিন। আমরা তোমার কাছে

শপথ নিচ্ছি, তোমার এই নির্দেশও সসম্মানে পালন করার জন্যে আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবো না।

"শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীবন্ধনের ভিত্তির উপর। এইটেই সোভিয়েত গণতন্ত্রের প্রথম ও মূল বনিযাদ। এই মৈত্রী না হলে শ্রমিক-কৃষক ধনী জমিদারদের পরাজিত কবতে পারতো না। কৃষকের সমর্থন ভিন্ন শ্রমিকবা ধনিকদের পবাজিত করতে পারতো না। আমাদের দেশের গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস তার প্রমাণ। কিন্তু সোভিয়েত গণতন্ত্রের সংহতির সংগ্রাম আজও শেষ হযনি। সে সংগ্রাম আজ একটা নতুন রূপ নিয়েছে মাত্র।

"আগে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী ছিলো সামরিক মৈত্রী। কারণ, শত্রু কোলচাক-দেনিকিনের বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগ করা হয়েছিলো। আজ সে মৈত্রীর রূপ হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা—শহরের সঙ্গে গ্রামের, মজুরের সঙ্গে কৃষকের। কারণ, আজ তার শত্রু বণিক এবং কুলাকেরা। আজ শ্রমিক-কৃষকের পরস্পব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে পরস্পরেব মধ্যে আদান-প্রদানই হচ্ছে সে মৈত্রীর উদ্দেশ্য। আপনারা জানেন, এই দিকে কমরেড লেনিনের মতো অক্লান্ত কর্মী আব দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই, আমাদের কাছ থেকে বিদায়কালে কমরেড লেনিন চেয়েছিলেন, আমবা যেন শ্রমিক-কৃষকের এই ঐক্যকে আমাদের সর্বশক্তি দিযে মজবুত কবে তুলি। কমরেড লেনিন! আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি যে, আমরা তোমার এই নির্দেশও সসম্মানে পালন করবো।

"সোভিযেত গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের দেশেব বিভিন্ন জাতিব শ্রমজীবী জনগণের মৈত্রী। রুশ ও ইউক্রেনিয়ান—আরমেনী ও দাঘেস্তানী,—তাতার ও কিরঘিজ,—উজবেক ও তুর্কমেন—শ্রমিক শ্রেণীব একনায়কত্বকে শক্তিশালী করায় সকলেরই সমান স্বার্থ—একই অবদান। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব যে শুধু এই সব জাতিকে অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে তাই নয়, এই সব

জাতিও আবার সোভিয়েত গণতন্ত্রের প্রতি চরম আনুগত্য এবং ত জন্যে সব সময়েই স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত। যা দিয়ে আমরা আমাদে সোভিয়েত গণতন্ত্রকে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের ষড়যন্ত্র এবং আক্রম থেকে মুক্ত করবো। কমরেড লেনিন অবিশ্রান্তভাবে আমাদে দেশের সর্বজাতির স্বেচ্ছা-মিলনের, সোভিয়েত রিপাবলিকগুলি ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতা প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে এসেছেন। তাই, আমাদের কাছ থেকে বিদায়কালে কমরেড লেনিন চেয়েছিলেন যে আমরা যে রুশীয় সোভিয়েতের গণতন্ত্রগুলির ঐক্যকে সংহত এবং সম্প্রসারিত করি। কমরেড লেনিন! আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি তোমার এ নির্দেশও আমরা সসম্মানে পালন করবো।

"শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের লাল-ফৌজ ও লাল নৌবহর। লেনিন আমাদের একাধিকবার বুঝিয়েছেন যে, ধনবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিরোধিতা থেকে আমরা যে মুক্তি অর্জন করেছি, হাঁফ ছাড়ার অবসর পেয়েছি, সেটা হয়ত বেশি দিন টিঁকবে না। তিনি বার বার আমাদের জানিয়েছেন যে লালফৌজকে শক্তিশালী এবং উন্নত করে তোলাই আমাদের পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলোর অন্যতম। কার্জনের চরমপত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি এবং জার্মানীর সংকট বরাবরের মতন, আরও একবার প্রমাণ করেছে যে, লেনিনের কথাই ঠিক। অতএব কমরেডগণ! আসুন, আমরা শপথ নিই যে, আমরা লালফৌজ ও লাল নৌবহরকে শক্তিশালী করার জন্যে কোন চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

"বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর মহাসমুদ্রের মধ্যে আমাদের দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পর্বতের মতন। চারিদিক থেকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে একে আঘাত করছে। একে ডুবিয়ে দিতে—ভাসিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এ পর্বত অটল। কিসে এর শক্তি? এই শক্তির কারণ শুধু এই নয় যে: আমাদের দেশের ভিত্তি শ্রমিক এবং কৃষকের ঐক্য—বা স্বাধীন জাতিগুলোর স্বেচ্ছা-

মিলন,—বা লালফৌজ এবং লাল নৌবহরের শক্তিশালী বাহুর দ্বারা আমাদের দেশ সুরক্ষিত। আমাদের দেশের শক্তি, দৃঢ়তা এবং ঐক্যবদ্ধতার মূলে রয়েছে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক ও কৃষকের হৃদয়ের অসরিসীম সহানুভূতি এবং অকুণ্ঠ সমর্থন।

"কমরেড লেনিন কর্তৃক শত্রুর শিবিরে নিক্ষিপ্ত এক অব্যর্থ শরের মতন,—অত্যাচার এবং শোষণের হাত থেকে মুক্তির আশার বিজয়স্তম্ভের মতন,—মুক্তির পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারার মতন,—আমাদের এই সোভিয়েত গণতান্ত্রিক দেশটাকে সমগ্র পৃথিবীব শ্রমিক ও কৃষকগণ বাঁচিযে রাখতে চায। তারা একে বাঁচাতে চায়, এ দেশটাকে কিছুতেই তারা ধনিক-জমিদারদের হাতে ধ্বংস হতে দেবে না। আমাদের শক্তির মূল সেইখানেই। সারা দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের শক্তির মূলও সেইখানে ;—আর সেইখানেই সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের দুর্বলতারও মূল। সোভিয়েত রিপাবলিককেই চূড়ান্ত কথা বলে লেনিন কখনই মনে করেন নি। তাঁর কাছে এটা বরাবরই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের যোগাযোগ শক্তিশালী করার জন্যে প্রয়োজনীয় একটা অঙ্গ-স্বরূপ ছিলো। আর তা এমন একটা অঙ্গ যার সাহায্যে সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদের উপর শ্রমজীবী জনগণেব বিজয় সহজতর হয়।

"লেনিন জানতেন, কী আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের দিক থেকে, কী সোভিয়েত গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার দিক থেকে—এই আদর্শই ঠিক। লেনিন আরও জানতেন যে, এই আদর্শই সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণকে চরম মুক্তির সর্বশেষ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিভাবান নেতা লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরমুহূর্তেই শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংঘের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাই তিনি সারা দুনিয়ার শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'কে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন।

"গত কয়েকদিন ধরে আপনারা দেখেছেন কেমন করে লক্ষ লক্ষ

লোক তীর্থদর্শনের মতো করে ভিড় করেছে: কমরেড লেনিনের শবাধার দেখতে। শীঘ্রই আপনারা দেখবেন, কোটি কোটি শ্রমজীবীর প্রতিনিধিদল কমরেড লেনিনের শবাধার দেখার জন্যে তীর্থযাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। এ বিষয়েও আপনাদের সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই যে, এ দেশের—এই কোটি কোটি শ্রমজীবীর প্রতিনিধিদলের পেছনে তীর্থযাত্রায় আসবেন পৃথিবীর সকল অংশ থেকে শত কোটি শ্রমজীবীর প্রতিনিধিদল।—এবং যাঁরা এসে এই কথাটিই প্রমাণ করবেন যে, লেনিন শুধু রুশ শ্রমিকদেরই নেতা নন,—শুধু ঔপনিবেশিক প্রাচ্য দেশগুলোরই নেতা নন,—তিনি সমস্ত পৃথিবীর শ্রমজীবী জনগণেরই নেতা।

"আমাদের কাছে বিদায়কালে কমরেড লেনিন চেয়েছিলেন: আমরা যেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। কমরেড লেনিন! আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি: সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সংঘ—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে' শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করার জন্যে আমরা জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।"

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' 'লেনিন জিন্দাবাদ!'*